বিচিত্র

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

ডি. এম্. লাইব্রেরী
৪২, কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট
কলিকাতা ৬

প্রথম সংস্করণ : চৈত্র ১৩৫৯

মূল্য—দুই টাকা
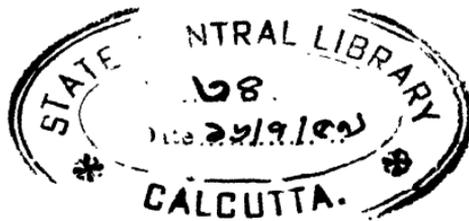
প্রচ্ছদপট : আশু বন্দ্যোপাধ্যায়

ডি, এম, লাইব্রেরী হইতে শ্রীগোপালদাস মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত ও

...হন গুপ্ত কর্তৃক মুদ্রিত।

পরম প্রীতিভাজন

শ্রীযুক্ত অমলেন্দু দাশগুপ্ত

করকমলেষু

চৈত্র—১৩৫৯

টালা পার্ক

এক

"জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে
তুমি বিচিত্ররূপিণী।"
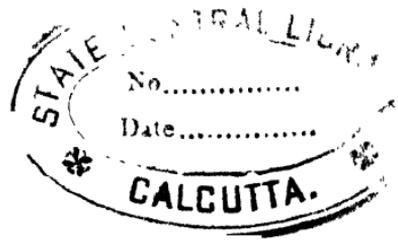
মানুষের জীবনে এই বিচিত্রের একটি অনুসন্ধান বোধ করি তার জীবনধর্ম। এই বিচিত্ররূপিণী রহস্যময়ীকে সে অনুসন্ধান ক'রে চলে সারা জীবন। কোথাও কখনও চকিতের মত তার সঙ্গে চোখোচোখি হয়; সেই মুহূর্ত জীবনে তার অক্ষয় হয়ে থাকে। এই দুর্লভ চকিত সাক্ষাৎ কদাচিৎ তার ভাগ্যে ঘটে। বৈজ্ঞানিক বলবেন, সব ক্ষেত্রেই মানুষের ইতিহাসে এই সাক্ষাৎ ভ্রান্তি-বিলাসের ইতিহাস। এই থেকেই ভূত-প্রেত বহু রহস্যের সৃষ্টি হয়েছে। মানুষ তাকে যত ভয় করেছে তত ভাল বেসেছে। ঠিক এই কারণেই অনুকূল কোন পটভূমি এবং কাল সম্মুখে পেলেই মানুষের ভয় ও ভালবাসার এই বিশ্বাস এক কল্পনার মূর্তি ধ'রে সামনে দাঁড়ায়; তা হ'লেও কিন্তু মিথ্যার মধ্য থেকেও একটা সত্যের সাক্ষাৎ মানুষ পায়।

কাল্পনিক বিচিত্ররূপিণীকে মানুষ যখন ভ্রান্তির মধ্যে নিজে গ'ড়ে নিজের সামনে ধ'রে দেখে তখন ওই সাক্ষাৎকারের যে স্বাদ, সে স্বাদের যে গাঢ়তা, যে মাধুর্য সেটা মিথ্যা নয়। কথাটা হ'ল এই—হোক না কেন যা দেখলাম তা আমারই কল্পনায় গড়া অলীক মিথ্যা, কিন্তু তাকে দেখে আমার মন যে রহস্যদর্শনের রসানুভূতিতে অভিভূত হ'ল—তার আস্বাদন-মাধুর্য তো মিথ্যা

নয়। শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্তে' তর্ক ক'রে শ্রীকান্ত যখন শ্মশানে গিয়ে একা আসন গ্রহণ করলে, যখন বাতাস উঠল শ্মশান-ভূমে, শকুন-শিশু কাঁদল গাছের মাথায়, বাতাসের প্রবাহ নরকপালের গহ্বরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে দীর্ঘশ্বাসের ধ্বনি তুললে, তখন শ্রীকান্ত যে অনুভূতি অনুভব করলে সেই অনুভূতির ফলেই তো খুলে গেল তার তৃতীয় নয়ন, তখনই তো সে দেখতে পেলে কালোর রূপ। বলে উঠল—কে বলে কালোর রূপ নাই! শরৎচন্দ্রই যে এই শ্মশানসাধক শ্রীকান্ত তাতে আর সন্দেহ নেই। 'শ্রীকান্তে'র অন্য ঘটনাগুলির সঙ্গে শরৎচন্দ্রের জীবনে কতখানি মিল আছে সে আলোচনা না ক'রে এ ঘটনাটি সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হবেন বোধ করি সকলেই। সেদিন সে শ্মশানে কালোর এমন একটি স্তবগান তিনি নিশ্চয় করেন নি, সে দিন ওই শ্মশানভূমে আকাশ থেকে মাটির বুক-জোড়া নিবিড় নিকষ অন্ধকারের মধ্যে যে ভাবরসে তিনি অভিভূত হয়েছিলেন তাতে ঠিক সেই মুহূর্তে ওই অভিভূত অবস্থায় তখনই বাক্য যোজনা ক'রে স্তবগান রচনার কথা নয়। সেদিন সে-সময় ওই অনুভূতিই বড়। হয়তো সব। এবং এ অনুভূতি তাঁর জীবনে অক্ষয় হয়ে রইল অতীন্দ্রিয় লোকের সঙ্গে সত্য-সাক্ষাতের স্মৃতির মত। পরবর্তী কালে সবই মিথ্যা মনে হয়েছে, শ্মশানের বাতাস, শকুনের কান্না সবই ধরা পড়েছে, কিন্তু ওই কালোর রূপ দেখা, সে মিথ্যা হয় নি। মিথ্যা সেদিন আয়োজন ক'রে তাঁকে ছলনা করতে গিয়ে সত্যের আস্বাদ দিয়েছে। অন্তত সে আকাশ-জোড়া কালো তাঁর চোখের সামনে ভুবনমোহন রূপে দোল খেয়েছে এক বিরাট যবনিকার মত, সেই যবনিকার অন্তরালেই মহাসত্য সে মুহূর্তে এসে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। শরৎচন্দ্রের রহস্যানুসন্ধানী মন

সেদিন রহস্যের আভাস পেয়েছিল। বিচিত্রকে আভাসে অনুভব করেছিল।

এই বিচিত্রকে অনুভব বলায় যদি বা কারও আপত্তি থাকে তবে আপনার যে অজানাকে আদিকাল থেকে মানুষের মহাভয় সেই অজানার সঙ্গে কল্পনায় মানুষের মুখামুখি দাঁড়ানো—একথা বললে নিশ্চয়ই আপত্তি হবে না। এই কল্পনা কল্পনা বা ভ্রান্তি হ'লেও এমনই সত্য যে, ওই মহাভয়ের মূলে যে রস সে অমৃত। এই রসই মৌলিক রস, তা আস্বাদনে বাধা হয় না। এ আস্বাদে এবং আত্মবিলুপ্তির আস্বাদে কোন প্রভেদ নেই। যে বিচিত্র পুষ্পিত অরণ্যভূমে গাঢ় নির্জনতার মধ্যে অকস্মাৎ দেখা দেন, অকস্মাৎ পূর্ণিমা-রাত্রির প্রান্তরের মধ্যে শুভ্রবসনা সুন্দরীর মত আবির্ভূত হয়ে চকিতের জন্য অবগুণ্ঠন মোচন ক'রে অন্তর্হিতা হন যে রহস্যময়ী, ইনি তিনিই। ভয়ঙ্করী-রূপা হয়ে তিনি যখন দেখা দেন তিনি তখন অমোঘা, তিনি তখন অতিপ্রত্যক্ষা, অতিস্পষ্টরূপে প্রকটিত। দেখা দেন কিন্তু কয়েকটা মুহূর্তের জন্য। দেখা দিয়েই তিনি মিলিয়ে যান, মানুষের হৃৎস্পন্দনে বাজিয়ে দিয়ে যান তাঁর নূপুরধ্বনির প্রতিধ্বনি। তখন সেই মহাভয় পরিণত হয় আনন্দে অমৃতে। ভয়ঙ্করী বিচিত্র মনোহারিণী হয়ে ওঠেন স্মৃতির মধ্যে। আবার এমনও হয় যে, মানুষ সেই কল্পনার মোহে হয়ে ওঠে উন্মত্ত, দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য। দুই হাত বাড়িয়ে সে ছুটতে থাকে। আর সারা সংসার তার পিছনে ছোটে ভয়ে অভিভূত হয়ে। তাই তাকে বলি বিচিত্র।

অমনি একটি ঘটনার কথা দিয়েই শুরু করব বিচিত্র-সন্ধানী মনের কথা। নিজের কথার আগে একজন সামান্য, সাধারণ, অতি সামান্য, অতি সাধারণ মানুষের কথা বলব।

(ক)

ইংরিজী ১৯২৯ সাল। আমি তখন লাভপুর ইউনিয়ন-বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট। আসলে ভাইস প্রেসিডেণ্ট। কিন্তু প্রেসিডেণ্টের দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে আমিই প্রেসিডেণ্টের ক্ষমতা নিয়ে কাজ চালাই। বর্ষার শেষ, ভাদ্র মাসের চতুর্থ সপ্তাহ। দীঘি পুকুর ডোবা জলে ভ'রে উঠেছে। সে বৎসর বর্ষা হয়েছিল প্রবল। মাঠ থৈ-থৈ করছে জলে, কাঁদর নালা জলস্রোতের কলধ্বনিতে মুখরিত, গ্রামের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বক্রেশ্বর এবং কোপাইয়ের মিলিত ধারা কুয়ে নদীতে তুফান চলেছে। এমনটা আমাদের দেশে কদাচিৎ হয়। বিশ ত্রিশ বৎসর অন্তর এমন বর্ষা আসে। মাঠে সেবার ভাদ্র মাসের শেষেই ধানগাছগুলি প্রায় কোমরের সমান উঁচু হয়ে উঠেছে।

ওদিক ম্যালেরিয়া এসে হাজির হয়েছে সদর-দরজায়, ঘরে ঢুকে আসন পাতি-পাতি করছে।

ইউনিয়ন-বোর্ডের কর্মভারের মধ্যে স্বাস্থ্যোন্নয়নও আছে। ম্যালেরিয়া-বিতাড়নের যে কয়টা পন্থা তখন প্রচলিত ছিল তার মধ্যে সবচেয়ে সহজসাধ্য ছিল টোপাপানা বা ডঁরুলি তুলে ফেলা। এ পন্থাটি আবিষ্কার করেছিলেন—বাংলা দেশেরই একজন হেল্‌থ অফিসার। এ আবিষ্কারের তত্ত্বটি হ'ল এই যে, এ্যানোফিলিস নামক যে মশক জাতি ম্যালেরিয়ার বিষ বহন করে এবং মানুষের রক্তে সেই বিষ সংক্রামিত করে সেই অ্যানোফিলিস যতক্ষণ এই বিশেষ জাতীয় টোপা পানার রস পান না-করে ততক্ষণ পর্যন্ত তার এই বিশেষ ক্ষমতা জন্মায় না। ঠিক মনে নেই, হয় ম্যালেরিয়ার বীজাণু এই রসে পুষ্ট না হ'লে কার্যকরী হয় না, বা ওই মশক ওই রস পান না করলে এই বীজাণু বহনের ক্ষমতা অর্জন করে না—এমনি একটি তত্ত্ব। মোট কথা,

ম্যালেরিয়ার বীজাণুও থাকুক, অ্যানোফিলিস থাকুক, টোপা পানা না থাকলেই ম্যালেরিয়ার প্রসার ও প্রচার বন্ধ। সরকারী স্বাস্থ্য-বিভাগ থেকেও এই তত্ত্বটি অনুমোদন এবং সমর্থন পেয়েছিল। সেই অনুযায়ী মশা ছেড়ে দিয়ে টোপা পানার ওপর পড়েছিল স্বাস্থ্য বিভাগের আক্রমণ। স্বর্গীয় দত্ত সাহেব নাচের দল নিয়ে টোপা পানার ধ্বংসের কাজেও আসরে নেমেছিলেন। টোপা পানা তুলে তাতে খড় সংযোগে আগুন দিয়ে চারিপাশে ব্রতচারীদল নৃত্য করত আর গান করত—

"মশার মাসী সর্ব্বনাশী
আয় দোব তোর গলায় ফাঁসী
ছিড়ব রে তোর ঘেরা টোপ
পোড়াব তোর দাড়ি গোঁফ।"

গানটির লাইন ঠিক মনে নেই, তবে মশার মাসী শব্দটি আছে এবং 'পোড়াব তোর দাড়ি-গোঁফ' লাইনটিও আছে। তখনকার উৎসাহ এমন এবং আই-সি-এস-কবি দত্ত সাহেবের প্রতাপ এমন যে মাসীর দাড়ি-গোঁফ কি ক'রে গজাল বা যার দাড়ি-গোঁফ আছে সে মেসো না হয়ে মাসী কেন হ'ল এ প্রশ্ন তুলবার কারও অবকাশও হয় নি এবং সাহসও হয় নি। সম্ভবত সর্বনাশী গালিটি দেবার জন্যই মাসী এবং ফাঁসি কাব্যে আমদানি হয়েছিল।

যাই হোক, ডঁরুলি মেসোই হোক বা মাসীই হোক কি ডঁরুলি ডঁরুলিই হোক, তাকে নেচে পুড়িয়ে শেষ করা যায় না—শেষ করতে হ'লে মজুরের দরকার করে। বর্ষার শেষে পুকুরগুলি ভ'রে উঠলে পুকুর থেকে এই টোপা পানা তুলে ফেলার কাজ ইউনিয়ন-বোর্ডের কাঁধে এসে পড়ত ;—এবং বোর্ড মজুর লাগিয়ে ডঁরুলি তুলে ফেলত। জন কয়েক বাউরী-মজুরকে নিয়মিতভাবে এই কাজে আমার বোর্ড থেকে

নিযুক্ত ক'রে রাখা হয়েছিল। এদের মধ্যে দুজন ছিল—যারা নাকি পরস্পরের খাঁটি মিত্র। রাষ্ট্রবিপ্লব—দিল্লী অনেক দূরের ব্যাপার এদের কাছে, রাজধারাও তাই, ওই দুটো ক্ষেত্র ছাড়া—উৎসব-ব্যসন-দুর্ভিক্ষ-শ্মশান সব ক্ষেত্রেই পরস্পরকে ছেড়ে ওরা থাকত না। মদের দোকানে, গানের আসরে, যাত্রাগানের আসরে পাশাপাশি বসত, একে অন্নের ভাগ অপরকে দিত। মড়া পোড়াতে যেতে হ'লে দুজনের দুটো কাঁধ দুই পাশেই থাকত। কঠিন পরিশ্রমে দুজনেরই ছিল সমান ভয়। গান গাইত গলা মিলিয়ে—

চাষকে চেয়ে গোরা চাঁদ রে মাহিন্দেরি ভাল।

এ ক্ষেত্রে গোরাচাঁদ সেই নদীয়ার গোরাচাঁদ—তাকে সম্বোধন ক'রে দুজনে গলা মিলিয়ে নিবেদন করত—হে প্রভু গোরাচাঁদ চাষে খাটা অতীব কঠিন কর্ম; এর চেয়ে 'মাহিন্দারি' অর্থাৎ 'মাহিনাদারী'—গো-সেবার চাকুরীও অনেক ভাল। তাতে থাকে কিল চড় চাপড়। বাঁধা ভাত কাপড়ের সুখে সহ্য হয়। করুক মনিব বাপান্ত কিন্তু মাঠ ভরা জলে উদয়াস্ত খেটে পায়ে হাতে হাজা হয় না, পিঠে দাদ চুলকানি হয় না। এমন প্রকৃতির দুই বন্ধু, নাম—নিত্যানন্দ এবং পাঁড়ে। পাঁড়ের নাম পাঁড়ে কেন এ গবেষণা কেউ কোনদিন করে নি। নেত্যো এবং পাঁড়ে! প্রতিদিনই তারা কোন-না-কোন পুকুরের পানা তুলত বা ঘাট পরিষ্কার করত। অপরাহ্নে এসে টিপছাপ দিয়ে পয়সা নিয়ে গলা ধরাধরি ক'রে গান গাইতে গাইতে বাড়ি ফিরত গ্রামের দক্ষিণের রেলপথ ধ'রে।

(খ)

যে দিনের ঘটনা সেই দিন অপরাহ্নে ইউনিয়ন বোর্ড-আপিসে ব'সে আছি, এমন সময় একা নেতো এসে হাজির হ'ল। বললে—পাঁড়ে আসছে। অনেকক্ষণ যায়, পাঁড়ের প্রতীক্ষায় ব'সে রয়েছি, নেতো রয়েছে, সেক্রেটারি রয়েছে, আমি রয়েছি; পাঁড়ে আসে না।

অবশেষে নেতোর হাতেই দুজনের মজুরি দিয়ে তাকে বিদায় ক'রে আমরা বেরিয়ে এলাম।

এর ঠিক ঘণ্টা দেড়েক পরে।

আমার বৈঠকখানায় তাসের আড্ডা বসেছে। কৃষ্ণপক্ষের সন্ধ্যা; আকাশে মেঘ। বন্ধুরা কয়েকজন তাস নিয়ে বসেছেন—আমি বসেছি একখানা বই নিয়ে। অকস্মাৎ গ্রামপ্রান্তে একটা আর্ত কলরব শোনা গেল। কি হ'ল? চকিত হয়ে উঠলাম আমরা। ওদিকে কলরব বেড়ে চলেছে মুহূর্তে মুহূর্তে। একটা দুর্ঘটনা ঘটে চলেছে যেন, এখনও ঘ'টে শেষ হয় নি: যেমন হয় আগুন লাগলে। কিন্তু সময়টা বর্ষার সময়, আগুনের তো কাল নয় এটা! ছুটে সকলে বেরিয়ে গেলাম। আমাদের বৈঠকখানা থেকে গ্রামপ্রান্ত সাধারণ পদক্ষেপে মিনিট ছয়েকের পথ। ছুটে গেলাম তিন মিনিটে। আমাদের গ্রামের প্রান্তরেখা রেল লাইন দিয়ে চিহ্নিত করা। লাইনের ওপারেই বিস্তীর্ণ কৃষিক্ষেত্র। প্রায় দুই আড়াই মাইল প্রশস্ত। লাইনের উপর প্রায় পঞ্চাশ-ষাট জন মানুষ দাঁড়িয়ে হায়-হায় করছে। লাইনের ওপারে আকাশ-ভুবন-জোড়া মেঘলা কৃষ্ণপক্ষের রাত্রির অন্ধকার। মাঠের গাঢ় সবুজ ধান আর আকাশের নীল সেই অন্ধকারের মধ্যে মিশে একাকার হয়ে গিয়েছে; শুধু ওই অন্ধকারের মধ্য থেকে ভেসে আসছে একটা প্রাণ-ফাটানো আকুতি-ভরা ডাক, কেউ যেন প্রাণপণ চিৎকারে দিগন্ত পর্যন্ত ডাক ছড়িয়ে দিয়ে কাউকে ডাকছে—

দাঁড়া রে, দাঁড়া রে, দাঁড়া রে। ওরে দাঁড়া রে! এবং সে বিরতিহীন চিৎকার অতি বিচিত্র ও বিস্ময়কর ভাবে ক্ষণে ক্ষণে দিক পরিবর্তন ক'রে চলেছে। এখনি মনে হয় ঠিক সম্মুখে খানিকটা দূরে, পরক্ষণেই মনে হয় ডাইনের দিকে ছুটেছে সে ডাক, পরক্ষণেই মনে হয় আবার সামনে ঘুরে চলল এগিয়ে,—তার পরক্ষণেই মনে হয় ফিরল বাঁ দিকে।

তার পিছে ডাইনে বাঁয়ে অনেক মানুষের বিভিন্ন কণ্ঠের ডাক শোনা যাচ্ছে—নেতা, নেতা, নেতা, ওরে নেতা! কিন্তু ডাকগুলির সঙ্গে ওই ডাকের অনেক প্রভেদ। কণ্ঠস্বরের আকুতির গাঢ়তায়, প্রচণ্ডতায় অনেক প্রভেদ।

কি হ'ল? বুঝতে পারলাম না।

একজন প্রৌঢ়া বললে—নেতোকে ভুলোয় নিয়ে গেল গো!

ভুলো? বিচিত্র ছলনাময়ী রহস্য; সে নাকি মানুষকে ভুলিয়ে নিয়ে যায় এবং মানুষকে হত্যা করে। অন্ধকারের মধ্যে সে ছুটে চলে—বাতাসে ভর দিয়ে চলে হাতছানি দিয়ে ডেকে ডেকে, আর মানুষ চলে তার পিছনে ছুটে; প্রাণপণে ছোটে দুহাত বাড়িয়ে কিন্তু ধরা তাকে যায় না। তবু সে ছোটে—থামতে সে পারে না, থামা যায় না। ছুটতে ছুটতে দুর্ঘটনা ঘটে, জলের মধ্যে পড়ে, খানার মধ্যে পড়ে, হৃদ্‌পিণ্ড ফেটে যায়, সাপে কামড়ায়; মানুষ মরে। সামনে পড়ে জল তারই উপর দিয়ে লঘু পদক্ষেপে সে রহস্য হেঁটে চ'লে যায়; বিহ্বল অনুসরণকারী সেই পথে ছুটতে গিয়ে প'ড়ে অগাধ জলে। খানা-খন্দকের উপর দিয়ে সে চ'লে যায়, অনুসরণকারী সেই খানার মধ্যে প'ড়ে যায় মাথা গুঁজে। এমন অনেক গল্প শুনেছি। বিশ্বাস করি নি। আজ শুনে এবং সম্মুখে ওই গাঢ় অন্ধকারের মধ্য থেকে নেতার উন্মত্ত আকুল আকুতি-ভরা প্রাণ-ফাটানো চিৎকার শুনে বিস্ময়ের আর অবধি রইল না। এ যেন প্রাণের সর্বস্বকে নিয়ে

চোখের সামনে ওই অন্ধকারের মধ্য দিয়ে কেউ চলে যাচ্ছে আর প্রাণ-সর্বস্ব-হারা মানুষ তাকে ধরবার জন্য ছুটেছে। মুহূর্তে মুহূর্তে দূরে চলেছে, দূর থেকে আরও দূরে চলেছে। বিস্তীর্ণ ধান-ভরা জল-ভরা সরীসৃপ-সঙ্কুল, নালায় বাঁধে গাছের শিকড়ে বাধা-বন্ধুর পথ হেলায় অতিক্রম ক'রে ছুটে চলেছে।

দু মাইল দূরে ভাদ্রের ভরা কুয়ে নদী। নদীতে এবার তুফান; কুটিল ক্রূর আবর্ত ঘুরপাক খেয়ে প্রচণ্ড বেগে ছুটে চলেছে ওই মুখে। ডাইনে বাঁয়ে ঘুরে-ফিরেও গতি তার দক্ষিণমুখী; সম্মুখে দক্ষিণ দিকে নদী।

অপেক্ষা করতে পারলাম না। আমিও ছুটলাম।

(গ)

এক সময় মনে হ'ল নেত্যোকে বুঝি পেলাম। খুব কাছে শুনলাম নেত্যোর কণ্ঠস্বর। অন্ধকারের মধ্যে চোখ তখন অভ্যস্ত হয়ে এসেছে। অন্ধকারের মধ্যেও উন্মত্তের মত ধাবমান নেত্যোকে দেখতে পেলাম। একখানা ধান-ভরা ক্ষেতের ওপারে সে, এপারে আমি এবং আরও দু-তিন জন। সে কি তার ভঙ্গি—সে কি তার দিগ্বিদিক-জ্ঞানশূন্য গতির প্রচণ্ডতা! আর সে কি তার কণ্ঠস্বরের প্রচণ্ডতা এবং আকুলতা! সামনে আশেপাশে অন্ধকার আর অন্ধকার; শুধু কালো বায়ুস্তর, কিন্তু তারই মধ্যে নেত্যো যে কাউকে দেখছে, স্পষ্ট দেখছে সন্দেহ নেই। একটা হাত বাড়িয়ে সে যেন সম্মুখের তার আঁচল চেপে ধরতে যাচ্ছে, কিন্তু কিছুতেই ধরতে পারছে না। আমরা এবার নেত্যোকে পাব। যে পথে সে আসছে আমরা কোণাকুণি সেই দিকে ছুটেছি, নেত্যোর পথ রোধ ক'রে দাঁড়াব।

হঠাৎ নেতো ঘুরে গেল। যার পিছনে সে ছুটেছে সে যেন চোর-চোর খেলার খেলুড়ের মত তার হাতের সীমানা এড়িয়ে ঘুরে গেল ডান দিকে। নেতো ঘুরল; ঝাঁপিয়ে পড়ল জল-ভরা মাঠে। আমরা পিছনে প'ড়ে গেলাম। জল-ভরা ধান-ভরা মাঠে নামতে সাহস হ'ল না। দেখতে দেখতে নেতো আরও দুটো মোড় ফিরে চ'লে গেল দূরে। অন্ধকারের মধ্যে হাত বাড়িয়ে কাউকে ধরবার জন্য উন্মত্ত গতিতে নেতো ছুটেছে ডাইনে বাঁয়ে মোড় ফিরে—মোহিনীর পিছনে শিবের মত ছুটছে আর ডাকছে—দাঁড়া রে! দাঁড়া রে। ওরে দাঁড়া রে। পাঁড়ে! পাঁড়ে! পাঁড়ে!

ডাকছে সে পাঁড়েকে। পাঁড়েই তার মোহিনী।

অথচ পাঁড়ে আমারই সঙ্গে। সেও সাড়া দিচ্ছে—ওরে নেতো। ওরে, এই যে আমি। ওরে!

সে কথা নেতোর কানে যাচ্ছে না, ঢুকছে না। সে ছুটে চলেছে—অন্ধকারের মধ্যে কোন্ পাঁড়ে চলেছে—তার পিছনে। এ পাঁড়ে এ মুহূর্তে মিথ্যা হয়ে গিয়েছে তার কাছে।

সে পাঁড়ে ছুটে চলেছে অন্ধকারের মধ্যে সাঁতার দিয়ে। ওই নদীর দিকে।

সেই শ্রাবণ-রাত্রের গাঢ় গভীর অন্ধকার রাত্রির কুক্ষিগত বিস্তীর্ণ প্রান্তরের মধ্যে সেই বাউরী জোয়ান উন্মত্তের মত ছুটে চলেছিল, হাত বাড়িয়ে সে ছুটেছিল—সম্মুখেই তার প্রাণের পরম ধনের মত কল্পনার মূর্তি। যে মূর্তিকে সে ছাড়া আর কেউ দেখতে পাচ্ছে না। তার কাছে শুধু পৃথিবী অর্থাৎ স্থানই শুধু নয়—কালও অর্থাৎ চারিদিকে সেই গাঢ় অন্ধকারেরও বোধ করি অস্তিত্ব ছিল না—বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। তার কারণ বলছি: নেতো ছুটে চলেছে অন্ধকারের দিকে হাত বাড়িয়ে অথচ তার চারিপাশে না-হোক—তিন পাশে ডাইনে বাঁয়ে পিছনে

অনেকগুলি আলো তাকেই অনুসরণ ক'রে ছুটেছে—তবু সে আলো তার চোখে পড়ল না, সেই অন্ধকারের মধ্যে স্বাভাবিক ভাবে কোন ইসারা দিতে সমর্থ হল না। উন্মত্ত পদক্ষেপে ছুটে সে চলেছিল—খাল বিল কাঁটা পাথর—পায়ের তলায় যা এসেছে তারই উপর দিয়ে সে ছুটেছে; পথ বাছা দূরের কথা, পথের স্পর্শানুভূতিও সে অনুভব করছিল না। তাই বলছি, সেদিন তার স্থান কাল বিলুপ্ত হয়ে গিয়ে একমাত্র অবশিষ্ট ছিল তার মানস-কল্পনার পাত্র—তার পরম বন্ধু।

সম্মুখে দুকূল পাথার নদী।

নেতোর পরম বন্ধু ছুটে চলেছে ভরা নদীর দিকে। আমি এবং আরও অনেকেই মনে মনে অনুমান করলেম—বন্ধু তার ওই ভরা নদীর উপর দিয়ে লঘুপদক্ষেপে পার হয়ে ও-পারে মিলিয়ে যাবে; নেতো ডুবে যাবে ওই পাথারের মধ্যে। হয়তো বা যে মুহূর্তে ডুববে নেতো—সেই মুহূর্তে ওই জলস্রোতের তলদেশে কেঁউ তাকে বুকে জড়িয়ে ধরবে, বলবে—এই যে আমি। কিন্তু না, নেতো অকস্মাৎ দিক পরিবর্তন করলে, ছুটতে শুরু করলে নদীর সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে। এবার সে ছুটেছে—নদীর উপরে রেলের পুলের দিকে। রেলের পুল প্রায় চল্লিশ ফুট উঁচু—গোড়ার দিকটা বড় বড় পাথরের চাঙড় দিয়ে ঢাকা—তার উপরে লোহার জাল দিয়ে ঘেরা; একেবারে উপরে খানিকটা জায়গা এক বিঘত লম্বা, আধ ইঞ্চি মোটা—সূচালো লোহার কাঁটায় সমাচ্ছন্ন। নেতো অবলীলাক্রমে উঠে গেল সেই উপরে। সেই কাঁটার উপর গিয়ে দাঁড়াল। ও-দিকে চল্লিশ ফুট নীচে হাসছে তার পরম বন্ধু। ঠিক এই মুহূর্তে একজন তাকে জাপটে ধরলে। সে আমাদের ও-অঞ্চলের বিখ্যাত দাগী শশী ডোম। হরিণের চেয়ে সে ক্ষিপ্র। সে ঘুরপথে ছুটে গিয়ে ওর সামনে দাঁড়িয়ে নেতোকে জাপটে ধ'রে আয়ত্ত করলে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই, বোধ করি মিনিট চারেকের মধ্যেই, আমরা গেলাম। দশ-বারোটা আলো চারিপাশে এসে জমা হ'ল। দেখলাম, ক্ষতবিক্ষত-সর্বাঙ্গ নেত্যো পাথরের মূর্তির মত ব'সে আছে, নিস্পলক নিরুত্তর; শুধু হাঁপাচ্ছে, চোখ দুটি জবাফুলের মত গাঢ় লাল এবং বিস্ফারিত স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে—সে দৃষ্টিতে কোন কিছু দেখবার কোন ইঙ্গিত কোন চিহ্ন নাই; কোন দূর-দূরান্তে হয়তো বা অন্য কোন জগতের কিছুতে তার সে দৃষ্টি নিবদ্ধ রয়েছে। তার বাপ এল, ভাই এল, স্ত্রী এল—সামনে দাঁড়ালে, ডাকলে; তবু তার দৃষ্টি ফিরল না, কোন উত্তরও সে দিলে না। যে পাঁড়ে বন্ধুর জন্য উন্মত্ত হয়ে ছুটেছিল, সে এসে দাঁড়ালে তবুও কোন সাড়া এল না, দৃষ্টিতে এতটুকু পরিবর্তন দেখা দিল না। তার কাঁধ ধ'রে ঝাঁকি দিয়ে কোন সাড়া পাওয়া গেল না, দেহে তার স্পন্দন জাগল না। আমি নাড়া দিতে গিয়ে অনুভব করলাম—দেহটা যেন শক্ত হয়ে গেছে।

কোন রকমে তাকে তুলে ঘরে আনা হ'ল। মাইল দেড়েক পথ, নির্বাক-নিস্পলক নেত্যো এল যেন নিষ্প্রাণ মানুষের মত। সে যেন আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে।

আশ্চর্য! বাড়ির দরজায় এসেই সে চমকে উঠল; একটা আর্তচিৎকার ক'রে সে জ্ঞান হারিয়ে প'ড়ে গেল। তার পর যখন তার জ্ঞান হ'ল, সে তখন সহজ মানুষ। বললে—সে উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষায় রেল লাইনের উপরে পাঁড়ে-বন্ধুর প্রত্যাশায় ব'সেছিল। হঠাৎ এক সময় সে দেখলে, পাঁড়ে তার সামনে দাঁড়িয়ে এবং তাকে সে ইঙ্গিতে আহ্বান জানিয়েই চলতে শুরু করলে। নেত্যো তাকে বললে—দাঁড়া। সে দাঁড়ালে না। নেত্যো গতি দ্রুততর করলে, তবু ধরা গেল না। নেত্যো ছুটল, তবু ধরতে পারলে না। প্রান্তরে ধানের ক্ষেতের মধ্য দিয়ে সে ছুটল। এই একটু দূরে হাত বাড়িয়ে ধরা যাবে

হয়তো; কিন্তু না, ধরা যায় না। সে ছুটল তার পিছনে। কোথা দিয়ে সে ছুটেছে তা তার মনে নেই; কেমন ক'রে অঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে তাও তার স্মরণ হয় না।

এর পর থেকে নেতো সন্ধ্যা হ'লেই কেমন অভিভূত হয়ে যেত ভয়ে। তার এই ব্যাপারটি আমার কাছে শুধু কৌতূহলের বস্তু হয়েই র'য়ে গেল—ব্যাখ্যায় শুধু ভ্রান্তি ছাড়া আর কিছু মনে হ'ল না। এর চেয়ে একবিন্দু বেশি গুরুত্ব আরোপ করি নি। কিন্তু এর ব্যাখ্যা আশ্চর্যভাবে আমার সামনে এসে উপস্থিত হ'ল কিছু দিন পরেই। আমি নিজেই প্রত্যক্ষ করলাম।

দুই

১৯৩২ সালের আষাঢ় মাস। ঠিক ওই সন্ধ্যার পর। আকাশে গাঢ় ঘন মেঘ, ফিন্‌ফিনে ধারায় বৃষ্টি ঝরছে। মুহূর্তে মুহূর্তে অন্ধকার গাঢ় থেকে গাঢ়তর হয়ে উঠছে। বর্ষা সেবার প্রবল এবং প্র॰ম বর্ষা থেকেই বৃ॰ নেমেছে—প্রান্তরে প্রান্তরে কৃষিক্ষেত্র জলে ভ'রে উঠেছে। অন্ধকারের মধ্যেও ঘোলা সাদাটে জল আকাশমুখী হয়ে মাটির বুক ঘেঁষে একটি স্বচ্ছ প্রতিফলন ফেলেছে; অন্ধকারের মধ্যে সাদা কাপড় যেমন একটি প্রভা বিস্তার করে ঠিক তেমনই। সন্ধ্যায় তখন একখানি ট্রেন যায়; সেই ট্রেনে একজন রাজনৈতিক কর্মীর আসবার কথা। আসবেন গোপনে, আমারই কাছে আসবেন। তাঁর প্রতীক্ষাতেই গিয়ে দাঁড়াব রেল-লাইনের পাশে; তিনি স্টেশনে নামবেন প্ল্যাটফর্মের বিপরীত দিকে; তারপর এসে আমার সঙ্গে মিলিত হবেন। আমরা দুজনে নির্জন প্রান্তরে গিয়ে কথাবার্তা বলব। সন্ধ্যার মুখে বাড়ী থেকে বের হলাম। কিছু দূর গিয়েই দেখা হ'ল আমারই এক বাল্যবন্ধুর সঙ্গে। তাঁদের কাছারিবাড়ির বারান্দাতেই তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন; যাবেন মাঠে সান্ধ্যকৃত্যের জন্য। এই বন্ধুটি আমার মানুষ হিসেবে অতুলনীয় দুর্লভ মানুষ। প্রেম যেখানে, প্রীতি যেখানে—সেখানে তিনি তাঁর মর্যাদা রাখতে, তার সম্মান রাখতে বোধ করি সব কিছু উৎসর্গ করতে পারেন; অকপট বিশ্বাসে তাঁর কাছে যা গচ্ছিত করা যায়, তাকে তিনি জীবনমূল্যে রক্ষা ক'রেই ক্ষান্ত হন না, জীবনের পরপার যদি থাকে, তবে সেখান থেকে ছায়ামূর্তিতে ফিরে এসে সেই গচ্ছিত বস্তু প্রত্যর্পণ ক'রে যাবেন ব'লেই আমার বিশ্বাস। ইংরিজী শিক্ষায় কৃতকার্যতা লাভ করেন নি ব'লে মনে মনে তাঁর কুণ্ঠা আছে, লজ্জাও আছে। কিন্তু আমি জানি, এই নূতন যুগে অতীতকালের এক মহান

ঐতিহ্যের তিনি এক দুর্লভ অধিকারী। তিনি আমাকে দেখেই নেমে এলেন পথের উপর, বললেন—মাঠে যাবে? চল।

আমি নিশ্চিন্ত হলাম, মনের মধ্যে দুশ্চিন্তা বহন ক'রেই পথ চলছিলাম; ভাবছিলাম, যে রাজনৈতিক কর্মীটি আসবেন রাত্রে তাঁকে কি ভাবে নিরাপদে রাখব সেই কথা। তিনি তখন আত্মগোপনকারীরই সামিল। গোপনে নতুন আন্দোলনের ভূমিকা রচনা ক'রে ফিরছেন। আমার বাড়ি গভীর রাত্রেও নিরাপদ নয়। পুলিসের নজর তো আছেই—তার চেয়েও বেশি হ'ল আমার বাড়ির লোকের নজর। আমার বাড়িতে তখন বাইরের লোক অনেক। অন্তত বারো চোদ্দজন। তার মধ্যে কয়েকটি স্কুলের ছাত্র; তারা আমার বাড়িতে থাকে খায় এবং স্কুলে পড়ে। এ ছাড়াও আমার ছেলে। বালকমণ্ডলী তখন অসীম আগ্রহে, গভীর ঔৎসুক্যের সঙ্গে আমার প্রতিটি পাদক্ষেপ লক্ষ্য করে, প্রতিটি আগন্তুককে জানতে চায়, চিনতে চায়। তাঁদের পরিচয় জানতে চায়, তাঁদের সঙ্গে পরিচিত হতে চায়। মনে মনে স্থির করেছিলাম, আগন্তুককে অপরিচিত আশ্রয়প্রার্থী হিসাবেই নিয়েই যাব বাড়িতে কিন্তু তাতেও আশ্বাস পাচ্ছিলাম না। এই কৌতূহলী কিশোরদের দৃষ্টি অতি তীক্ষ্ণ—প্রায় অভ্রান্ত। ঠিক এই কারণেই এই বন্ধুটিকে পেয়ে আশ্বস্ত হলাম, নিশ্চিন্ত হলাম। মুহূর্তে মনে হ'ল পেয়েছি, নিরাপদ নিশ্চিন্ত স্থান পেয়েছি। মনে প'ড়ে গেল একটি বিদেশী গল্পের কথা। এক চাষীর কাছে আশ্রয় নিয়েছিল এক পলাতক অপরাধী। অনুসরণকারী রক্ষী যখন এল, তখন পলাতককে সে লুকিয়ে রেখেছিল খড়ের গাদার মধ্যে। রক্ষীদল তন্ন তন্ন ক'রে সন্ধান ক'রেও যখন পলাতককে পেলে না তখন দৃষ্টি পড়ল ওই চাষীর ছেলের উপর। চাষীর ঘরের কিশোর ছেলে—সরল গ্রাম্য ছেলেটির চোখে বিচিত্র

দৃষ্টি, বিস্ময় লোভ ভয় অনেক কিছুই খেলা করছে। রক্ষীদলের নায়ক চতুর এবং বিচক্ষণ। সে তাকে অন্তরালে নিয়ে গিয়ে লোভ দেখালে। লোভের বস্তু পেলে ছেলেটি ব'লে দিলে পলাতকের সংবাদ। রক্ষীদল সদর্পে গোয়ালের ভিতর থেকে পলাতককে ধ'রে নিয়ে গেল। চাষী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে। তার পর বন্দুক বের ক'রে ছেলেকে বললে—প্রার্থনা কর্। বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি নিতে হবে তোকে। এবং সে শাস্তি সে দিলে। আমার বন্ধু সেই ধরণের মানুষ। তাঁরই বাড়িতে রাখব আজকের আগন্তুককে। তাঁর কাছে কথাটা বলব—গ্রাম শেষ হ'লেই বলব। দুজনে এসে গ্রামপ্রান্তে পৌঁছেছি, কথাটা বলব, ঠিক এই সময় ডাক এল পিছন থেকে—বন্ধুর বাড়ির পাইক তাঁকে ডাকছে। দাঁড়ালাম দুজনে।

পাইক এসে বললে, আপনাকে ডাকছেন ন-বাবু। অর্থাৎ আমার বন্ধুর কাকা। শুনলাম, কে একজন ভদ্রলোক এসেছেন; বন্ধুকে বিশেষ প্রয়োজন। পত্তনির খাজনা দিতে এসেছেন। তাঁর তাড়া আছে।

বন্ধু বললেন, তুমি দশ মিনিট অপেক্ষা কর। পারবে?

পারব বই কি। পারতেই হবে। ইতিমধ্যে ট্রেনও আসবে, সুতরাং আগন্তুককে সঙ্গে নিয়েই প্রান্তরের দিকে যেতে পারব। বললাম, আমি কিন্তু এগিয়ে যাচ্ছি, রেল-লাইনের লেবেল ক্রসিঙের পাশে থাকব।

—ঠিক থেকো। আমি আসছি।

বন্ধু চ'লে গেলেন। আমি অগ্রসর হলাম। কৃষ্ণপক্ষের মেঘাচ্ছন্ন রাত্রির প্রথম প্রহর; ডাইনে একটা বিস্তীর্ণ বাগান রেল-লাইনের ধার পর্যন্ত প্রায় চলে গেছে, বাগানের চারিপাশে পাঁচিলের মত দুর্ভেদ্য ঘন তেঁতুল তাল গাছের সারি, ভিতরে বড় বড় আম লিচু প্রভৃতি ফলের গাছ। অন্ধকার ঘন ক'রে তুলেছে বাগানটার ছায়া; ডাইনে ঘোলাটে জল-ভরা মাঠ, সামনে রেল-লাইন; তার ও-পাশে সুবিস্তীর্ণ কৃষিক্ষেত্র। দূরে রেল-লাইনের ডিস্টাণ্ট সিগ্‌ন্যালের মাথায় গাঢ় রক্তবর্ণ আলোটা জ্বলছে। জনকোলাহল স্তব্ধ, বর্ষার উতলা বাতাস ব'য়ে যাচ্ছে সজল স্পর্শ বুলিয়ে। দাঁড়ালাম। চারিদিকে অসংখ্য কোটি কীট পতঙ্গের সমবেত বিচিত্র স্বরধ্বনি উঠছে; তাকে ঢেকে উঠছে বর্ষার মাঠে হাজার হাজার ব্যাঙের ডাক। মধ্যে মধ্যে শোনা যাচ্ছে মাঠের ভিতর থেকে—মানুষের দু-চারটে কথা; আর উঠছে অবিরাম ছপ্ ছপ্ শব্দ; জলে আছড়ে আছড়ে কেউ কিছু ধুয়ে ফেলছে। চাষীরা বীজক্ষেত থেকে ধানের বীজচারা তুলে ছপ্ ছপ্ আছাড দিয়ে শিকড়ের মাটি ধুয়ে নিচ্ছে। আমি দাঁড়ালাম লেবেল ক্রসিঙের ধারে। সামনে বিস্তীর্ণ কৃষিক্ষেত্র—দক্ষিণে প্রায় তিন মাইল বিস্তৃত, ডাইনে বাঁয়ে পূর্ব পশ্চিমে দেড় মাইল দেখা যাচ্ছে। জল-ভরা মাঠের ঘোলাটে জল—একটা বিরাট ধব্‌ধবে ফরাসের মত বিস্তীর্ণ হয়ে রয়েছে—মাটির বুক ঘেঁষে আকাশমুখী একটি প্রতিফলন পড়েছে এই স্বচ্ছতার। আকাশে মৃদুগম্ভীর মেঘ ডাকছে—গুরু গুরু গুরু ডাক। মধ্যে মধ্যে ক্ষীণ বিদ্যুতের চমকে চকিত হয়ে উঠছে; আকাশ মাটি জোড়া এই অন্ধকারে তরঙ্গ ব'য়ে যাচ্ছে যেন।

এরই মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতেই আমার মন দৃষ্টি চেতনা—সব বাইরের সঙ্গে সম্পর্ক হারিয়ে মনের মধ্যেই ব্যগ্র প্রতীক্ষায় ধ্যান-

মগ্ন হয়ে গেল এই আগন্তুকের। ট্রেন এল, স্টেশনে দাঁড়াল, বাঁশী বাজল সশব্দে—আবার তার যাত্রা শুরু হ'ল। আমার সামনে দিয়ে চ'লে গেল। আমার বুকের ভিতরটায় গুরু গুরু ধ্বনি উঠল। এইবার আগন্তুক আসবে। আমার চোখের সামনে আর তখন অন্ধকারাচ্ছন্ন বিস্তীর্ণ কৃষিক্ষেত্র নেই। আকাশ নেই; কোন শব্দ নেই; আছে শুধু রেল-লাইনের স্বল্প খানিকটা স্থান—একটি মানুষ আসবার মত একটি পথ। আর সব বিলুপ্ত হয়ে গেছে। অন্তরলোকে সে রয়েছে—ভাবনায় রয়েছে—চিত্তলোক জুড়ে রয়েছে—তাকে দেখছি। বাইরের দিকে তাকে দেখবার জন্য চোখ দুটি বিস্ফারিত নির্নিমেষ। কই সে? কই?

"তিমির অবগুণ্ঠনে বদন তব ঢাকি
কে তুমি মম অঙ্গনে দাঁড়ালে একাকী।
আজি সঘন শর্বরী মেঘমগন তারা
নদীর জলে ঝর্ঝরি ঝরিছে জলধারা
তমাল বন মর্মরি পবন চলে হাঁকি।"

—মহাকবির এই গানখানি সে দিন সেই বর্ষণঘন রাত্রির প্রারম্ভে আমার জীবনে মূর্ত হয়ে উঠেছিল। সেই রাত্রির কথা যখনই মনে হয় তখনই মনে পড়ে এই গানখানি।

কৃষ্ণপক্ষের মেঘাচ্ছন্ন আষাঢ়-রাত্রির প্রথম প্রহর। সম্মুখে অবাধ বিস্তীর্ণ কৃষিক্ষেত্র অন্ধকারের মধ্যে অবলুপ্ত হয়ে গিয়েছে, মনে হয়—এর পর আর কোথাও কিছু নাই। তারই মধ্যে বর্ষার মৌসুমী বায়ু বইছে—কখনও মৃদুমন্দ, কখনও উতলা তার গতি। উতলা গতির সঙ্গে সঙ্গে আসছে বর্ষণ; পিছনে আমবাগানের পত্র-পল্লবে উঠছে ঝরঝর শব্দ। এরই মধ্যে যার প্রতীক্ষায় আমি দাঁড়িয়েছিলাম সর্বাঙ্গ বর্ষাতিতে ঢেকে নিশ্চল নির্বাক হয়ে, তারই চিন্তায়, তারই ভাবনায় তন্ময় হয়ে গেলাম। আজও

বুঝতে পারি—জোর ক'রে বলতে পারি, সে তন্ময়তা দুর্লভ—সে তন্ময়তার মধ্যে কোথাও এক বিন্দু এক চুল ছিদ্র ছিল না। লক্ষীন্দরের লোহার বাসরঘরে ছিল একটি চুল পরিমাণ চক্ষুর অগোচর ছিদ্র; কালনাগিনী সেই ছিদ্রপথের মুখ বিষ-নিশ্বাসের বহ্ন্যুত্তাপে গলিয়ে পরিসর করে তুলে অনায়াসে প্রবেশ করেছিল সেই ঘরে। ভাবনার জনকে নিয়ে তন্ময়তার যে লোহার ঘরে বাসর পাতা যায়, সে ঘরে এমনই চুল-পরিমাণ ছিদ্র থাকলে বাইরের পৃথিবী যে কোন মুহূর্তে সেই পথে ঢুকে বসে—সে বাসর ব্যর্থ ক'রে দেয়। আমার তন্ময়তায় সেদিন সে ফাঁকি ছিল না। সম্মুখের যে পায়ে-চলা পথ—সেই পথ ছাড়া দেখতে দেখতে সব বিলুপ্ত হয়ে গেল। দেখলাম—একজন কে আসছে, চ'লে আসছে হনহন ক'রে। সর্বাঙ্গ তার আচ্ছাদনে আবৃত। মুহূর্ত কয়েক পরেই চিনলাম তার পাদক্ষেপ, তার আকৃতি অবয়ব। দীর্ঘাকৃতি মানুষ—দীর্ঘ লঘু পাদক্ষেপ। আমার বাঁ দিক থেকে এসে সামনে মুহূর্তের জন্য দাঁড়াল। তার পর সে চলতে শুরু করলে সম্মুখ পথে।

(গ)

সম্মুখে—দক্ষিণে সেই অন্ধকার অবলুপ্ত বিস্তীর্ণ কৃষিক্ষেত্র। ডাকলে আমাকে। ইশারায় ডাকলে। মুহূর্তে আমার মনে হ'ল, নির্জন নিরাপদ স্থানের জন্য সে চলেছে কৃষিক্ষেত্র পার হয়ে আমাদেরই তারা বাগানে। এই বিস্তীর্ণ কৃষিক্ষেত্রটির মাঝখান দিয়ে চ'লে গিয়েছে পাকা সড়ক—সিউড়ি থেকে কাটোয়া। তার ওপাশেই আমাদেরই একটি বাগান আছে। বাগানের মধ্যেই আছে তারা দেবীর মন্দির। আমার বাবা স্থাপন ক'রে গিয়েছিলেন। অনেক

আলাপ অনেক পরামর্শ এই বাগানে এর আগে হয়েছে। তা'ছাড়াও এই বাগানের মধ্যেই রডা আর্মস লুট কেসের অন্যতম বিপ্লবী কর্মী শ্রীনরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় একখানি বাড়ি করেছিলেন, আমিই তাঁকে জায়গা দিয়েছিলাম। সেই সূত্রে এই সব কর্মীদের কাছে এই বাগান বিশেষ পরিচিত। সে সেইখানে চলেছে—এই ভেবে আমি নীরবে অনুসরণ ক'রে চললাম। দীর্ঘ পদক্ষেপে লম্বা মানুষটি চলেছে দ্রুততালে। আমার সম্মুখে তার ও আমার মধ্যের আন পথটুকু; দু পাশে জলভরা মাঠের অস্তিত্ব নাই—আভাষ আছে। জলের উপর বৃষ্টিধারা পড়ার শব্দ শুনতে পাচ্ছি, দু পা, চার পা অন্তর আমার পায়ের সাড়ায় কীট-পতঙ্গ ব্যাঙ লাফিয়ে পড়ছে জলে। সে চলেছে—আমিও চলেছি। কৃষি ক্ষেত্রের একটা ফালি পার হয়ে পাকা শড়কের বাঁধের উপর সে উঠল। আজও আমার চোখের উপর ভাসছে সে মূর্তি। তার ওপাশে দক্ষিণ দিকে আমাদের সেই বাগান। কিন্তু সেই মূর্তি দক্ষিণ দিকে নামল না, পশ্চিম মুখে দিক পরিবর্তন করলে; শড়ক ধরেই এগিয়ে চলল। মুহূর্তে আমার মনে হল অদূরেই আছে একটি কালভার্ট; বড় একটি শিমুল গাছ তার ছায়া বিস্তার করে রেখেছে ওই কালভার্টটির উপর। এইখানেও অনেক দিন অনেক জটলা করেছি, পরামর্শ করেছি। বুঝলাম, ওই স্থানটিতেই কথা বলবে।

সে চলেছিল দ্রুত, গতি হল দ্রুততর। আমিও চললাম দ্রুততর গতিতে। শড়কের দুই পাশে ঘন কেয়াফুলের জঙ্গল। সে জঙ্গলের মধ্যে শেয়ালের বাসা। আগে এখানে থাকত হায়েনা, নেকড়া। আর এখন আছে বীরভূমের মাঠের কালো কেউটে। সেদিন কোন কথা মনে হয় নি। চলেছি, চলেছি। সে চলেছে আমিও চলেছি।

সে যখন রয়েছে তখন ভয় কোথায়, ভয় কিসের? সেই কালভার্ট পার হয়ে গেল সে—আমিও পার হলাম। আচ্ছন্ন হয়ে অনুসরণ করে চলেছি—মনে আর প্রশ্ন নাই, শুধু আছে উদ্বেগ—ওই মানুষটির সঙ্গ নেবার—তার হাত ধরবার; বুকের স্পন্দনও অনুভব করছি না। চলেছি বিস্তীর্ণ মজাপুকুরের ভিতর দিয়ে। সড়কটি এই মজাপুকুরের বুক চিরে চলে গেছে। মজাপুকুরের গর্ভে এখন ধান ক্ষেত হয়েছে; শুধু চারিপাশে উঁচু পাড় চারটি পুকুরের স্মৃতি বহন করছে। বিশাল আয়তন উঁচু পাড়, সেয়াকুলের জঙ্গল, বন শিরীষ ও কপিত্থের বন ছেয়ে রেখেছে এই পাড়গুলিকে। তারই ভিতর সরু এক ফালি পায়ে-চলা পথ। এই পথও খানিকটা গিয়ে আর নেই। আমার সম্মুখের পরম কামনার জনটি হঠাৎ পশ্চিম দিক থেকে মোড় ফিরে এই জঙ্গলের মধ্যে দক্ষিণমুখে ফিরল।

আমিও ফিরলাম। অনায়াসে নির্ভাবনায় প্রশ্নহীন শঙ্কাহীন চিত্তে দ্রুতপদক্ষেপে চলেছি। পাড়টির পশ্চিমদিকে একটি বিস্তীর্ণ প্রান্তর—আমাদের খেলার মাঠ। গ্রাম থেকে দেড় মাইল দূর। এই প্রান্তরের সমস্ত জল এসে নামে পাড় ভেঙে কৃষিক্ষেত্রের মধ্যে, এই ভাঙনে সেদিনে সেই বর্ষণ মুখর রাত্রে জল স্রোত নেমে চলেছে ঝর ঝর শব্দে। আমি জানি এই জলধারার দু পাশে অন্ধকারের মধ্যে নিকষ কৃষ্ণ দেহ কেউটে মুখ বের ক'রে বসে থাকে; মাছ, শামুক, ব্যাঙ—জলস্রোতে গা ভাসিয়ে চলে যাবে। সে ছোবল মেরে তাকে ধরবে। ক্ষুধার্ত—আহার প্রত্যাশী কালো কেউটে। আমি জানি। কিন্তু সে দিন মনে হয় নি। কেন হয় নি জানি না।

জানি না কেন, জানি বৈকি। সেদিন বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে আমার সম্মুখের ওই মানুষটি ছাড়া আর কোন কিছুর অস্তিত্ব আমার কাছে ছিল না।

স্থান ছিল না, কাল ছিল না, ছিল শুধু সে। আমার সকল কাম্য তার মধ্যেই কেন্দ্রীভূত হয়েছে, আমার জীবনের পথ ওই তারই পিছনে আঁকা হয়ে চলেছে, আমার সকল আনন্দ সকল সুখ সকল প্রাপ্তি সব—সব—সব যেন সে-ই। আমার পিছন মুছে গেছে—ঘর সংসার—এমন কি আমার নিজের অস্তিত্বও বোধ হয় বিলুপ্ত হয়ে আসছিল ক্রমশ। সে ছাড়া আমি মিথ্যা। এমনি একটি অনুভূতি আচ্ছন্ন ক'রে ফেলছিল আমাকে। কি গভীর, কি অমোঘ যে তার আকর্ষণ। সে পার হয়ে গেল সেই ভাঙন। আমিও গেলাম পার হয়ে। নিঃশঙ্ক অনায়াস পদক্ষেপে দ্রুত গতিতে। ভাঙনের ওপারে উঠলাম—স্পষ্ট মনে পড়ছে তার ও আমার মধ্যে দূরত্ব এর মধ্যে বৃদ্ধি পায় নি। এইবার সে নিশ্চয় থামবে। আমি গতি আরও দ্রুততর করলাম। সেও চলল, থামল না।

মজাপুকুরের পাড় অতিক্রম করে আর একটা গভীরতর ভাঙনে সে নামল, আমিও চললাম। নামব সেই ভাঙনে, ভাঙনের ওপারে ঘন তালগাছ ও শরবনের বেড়ার ঘরের মধ্যে আমারই জ্যাঠামশায়ের বাগান। দ্বিতীয় ভাঙন পার হয়ে সেই বাগানের বেড়ার ধারে উঠল সে। আমি এপার থেকে পা বাড়ালাম—ভাঙনে নামব। নিচে জলস্রোত বইছে। হঠাৎ আমাকে পিছন থেকে কে টানলে। পায়ের গতি রুদ্ধ হয়ে গেল। জটিল বাঁধনে কে যেন আমার পা দুটোকে বেঁধে ফেলেছে, আমি জড়িয়ে গিয়েছি কিছুতে।

(ঘ)

কি? কিসের বাধা?

সেয়াকুলের কাঁটার ঝোঁপের মধ্যে জড়িয়ে গিয়েছি। পায়ের হাঁটু অবধি দুই পায়ের কাপড আটকেছে। টানলাম কাপড়। খানিকটা ছিঁড়ল, কিন্তু আরও জড়িয়ে গেল। এবার বাধ্য হয়ে সেই অন্ধকারের মধ্যে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে গভীর মনঃসংযোগের সঙ্গে ছাড়াতে লাগলাম কাঁটা। একটি একটি ক'রে কাঁটা ছাড়ালাম। ছাড়িয়ে যখন উঠে দাঁড়ালাম—তখন সম্মুখের ভাঙনের ওপারে কেউ নেই। ঘন শরবন ও তালগাছের বেড়ার মধ্যে একটু মুমূর্ষু ব্যাঙের কাতর আর্তনাদ—সেই মেঘাচ্ছন্ন কৃষ্ণানিশীথিনীর স্তব্ধতার মধ্যে ধ্বনিত হয়ে চলেছে।

ব্যাঙটা মরছে, সাপে ধরেছে। কালো কেউটে অথবা গোখুরা। জ্যাঠামশায়ের ওই বাগানটি চিরদিন ভীষণ সর্প-সঙ্কুল।

সে কোথায় গেল? কোথাও কেউ নাই। থম থম করছে অন্ধকার, রিমিঝিমি ঝরছে জল, আকাশের দিগন্তে মধ্যে মধ্যে চমকাচ্ছে বিদ্যুৎ, বাতাস বইছে হা হা ক'রে; মরণ আর্তনাদ উঠছে ব্যাঙটার। ওপাশে ওই দূরে গ্রাম। এপাশে ওই পূবে দিগ-দিগন্তের নিশানা নাই। সর্বাঙ্গ ভিজে। বর্ষাতিটা ভারী হয়ে উঠেছে। পায়ের নিচের দিকটা জ্বলছে। ক্ষত বিক্ষত হয়ে গিয়েছে। জুতো বোধ হয় ছিঁড়ে গেছে। ভিজে সপ সপে হয়ে উঠেছে। দিগন্তজোড়া অন্ধকারের মধ্যে সেই জনহীন প্রান্তরে আমি দাঁড়িয়ে আছি একা। সে নেই।

আমার মন যখন একাগ্র হয়ে ওই কাঁটার বাঁধন ছাড়াতে নিবিষ্ট ছিল তখনই ভেঙে গিয়েছে আমার তন্ময়তা। তন্ময়তা ভেঙে গেছে যখন তখন সে কি আর থাকে? সে মিলিয়ে গেছে।

সেখানে আর্তনাদ করছে মৃত্যু-যন্ত্রণা-কাতর ব্যাঙটা।

মুহূর্তে আমি ফিরে এলাম জাগ্রত চেতনায়। সচেতন ধরণীতে।

স্থান কাল আমার চেতনার সম্মুখে প্রকটিত হল। আমি থরথর করে কেঁপে উঠলাম। এ আমি কোথায় এসেছি? এই ঘন অন্ধকার, বর্ষণ মুখর রাত্রি। তারই মধ্যে ওই সকরুণ মরণ-যন্ত্রণা-কাতর শব্দের সুনির্দিষ্ট ইঙ্গিত। মনে হল পায়ের নিচে ওটা খাদ নয়, পৃথিবীর প্রান্তভূমি। আমি বোধ করি পড়ে যাবার ভয়েই চেপে ধরলাম সেই সেয়াকুলের কণ্টক তীক্ষ্ণ একটা পল্লবকে। ওই—ওই আমাকে মাটির পৃথিবীতে টেনে ধরে রেখেছে। আমার পায়ের নিচে পৃথিবীর সীমা-শেষের মহাশূন্যতার মত ভাঙনটা। মহাভয়ে আমি আচ্ছন্ন হয়ে গেলাম।

ঠিক সেই মুহূর্তে আমার মনে হল, আমার দুই পাশে এসে দুজনে দাঁড়িয়েছে—একজন জীবন, একজন মৃত্যু। আজ এতকাল পরে তাদের প্রত্যক্ষ স্পষ্টরূপ আমার মনে নেই, তবে মনশ্চক্ষে আজও দুটি শুভ্র বস্ত্রাচ্ছাদিত অবয়ব ভেসে উঠছে। একজন, ঠিক আমার পায়ের তলার মাটির হাতখানেক পাশেই গভীর ভাঙনটার শূন্যলোকে দাঁড়িয়ে আছে, তার পায়ের তলায় ভাঙনের নিচে ব্যাঙটার কাতর শব্দ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে আসছে; আর একজন, এপাশের যে কণ্টকগুল্মটায় আমার কাপড় জড়িয়ে গিয়েছিল, সেই কণ্টকগুল্মটার মাঝখান থেকে আবির্ভূত। জীবনে সে একটা বিস্ময়কর মুহূর্ত, অসাড়, অবসন্ন, কিম্বা চরমতম প্রশান্ত স্তব্ধ। চেতনা বিলুপ্ত হয়ে চলেছে অথবা চেতনাকে অতিক্রম করে চৈতন্যের দিকে চলেছি। সে দিন যদি ভাঙনের তলায় ব্যাঙটা না আর্তনাদ করত তবে সেই অসাড় কয়েকটি মুহূর্ত অতিক্রম করে আমার সচেতনতা দ্রুত ফিরে আসত কিনা

সন্দেহ। কয়েকটা মুহূর্ত পরেই চেতনা আমার ফিরে এল। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল আশপাশ দূর দুরান্তর থেকে অন্তরাত্মা বিদীর্ণ করে আমাকে ডাকছে কারা। ডেকেছিল বোধ হয় পৃথিবী বসুমতী। মহাকবির 'যেতে নাহি দিব' ধ্বনি সেদিন আমি শুনেছিলাম। তার মধ্যে শুনেছিলাম আমার মায়ের কণ্ঠস্বর—স্ত্রীর কণ্ঠস্বর, পুত্রের কণ্ঠস্বর। ক্রমশ ধ্বনি কোলাহল স্পষ্টতর হয়ে উঠল। এবং এতক্ষণে অনুভব করলাম কোলাহল উঠছে ষ্টেশনের ওদিকে, সে কোলাহল যাত্রী দলের। সেই সমগ্র ক্ষণটার পরিমাণ বোধ কয়েকমিনিট মাত্র। আমি ফিরলাম, প্রায় লাফ দিয়ে ভাঙ্গনের ধার থেকে সরে এলাম—হাত খানেক দূরে; এসে দাঁড়ালাম এক টুকরা সমতল পরিচ্ছন্ন জায়গায়। পিছনে একটা শব্দ হল। ঝপ্ করে মাটির খানিকটা চ্যাঙড় খসে পড়ল সেই ভাঙনের ভিতর। আমার সন্দেহ রইল না—ভেঙে পড়েছে সেইখানটাই যেখানে আমি দাঁড়িয়েছিলাম এই কয়েক মিনিট। আমারই ওজনে ভিজে মাটি এতক্ষণ ধরে ফেটে আসছিল। আমি সরে না-এলে আরও দু-এক মুহূর্ত আগেই ধ্বসে পড়ত আমাকে নিয়ে।

(৬)

এবার শক্ত মাটীর উপর দাঁড়িয়ে সচেতন দৃষ্টিতে চারিদিক চেয়ে দেখলাম। দক্ষিণে মৃত্যুপুরীর প্রগাঢ় অন্ধকারপুঞ্জের মত সেই বাগানটা, পূর্বে পশ্চিমেও অন্ধকার—সে অন্ধকার শূন্যলোকের মধ্যে স্বাভাবিক রূপ নিয়ে সম্প্রসারিত, উত্তরে আমাদের গ্রাম—সেখানে দেখা যাচ্ছে এখানে ওখানে আলোকবিন্দু—ষ্টেশনে, স্কুল-বোর্ডিংয়ে, দু-একখানি বড় বাড়ীর মুক্ত বাতায়নের ওপারে

ঘরের মধ্যে জ্বলছে আলো। ওখান থেকেই আসছে মানুষের সাড়া। বুকের ভিতরটা ঘনস্পন্দনে স্পন্দিত হচ্ছে, ভিতরে যেন প্রাণপুরুষ থরথর করে কাঁপছে; এতক্ষণ পর্যন্ত যার জন্যে সে লালায়িত হয়ে ছুটে এসেছে এতদূর—তার অঙ্গবায়ুর স্পর্শেই সে হয়ে পড়েছে অবসন্ন। কালিন্দীতটে নওলকিশোরের প্রথম স্পর্শ-বিধুরা রাধার মত তার অবস্থা। নওলকিশোর তার হাতখানি বারেকের জন্য স্পর্শ করেই চকিতে গেলেন ঘনবনান্তরালে মিলিয়ে। থরথর করে কাঁপতে লাগলেন চিরকিশোরী। মনে হল একূলে-ওকূলে দুকূল গোকুলে কেউ কোথাও নাই; এপার হয়েছে শেষ, ওপার হয়েছে সুরু, তারই সন্ধিস্থলে এসে দাঁড়িয়েছেন। মনে মনে প্রশ্ন করলাম বারবার—কাকে দেখলাম! কি দেখলাম! চোখের ভ্রম? মনের ভ্রান্তি? এত স্পষ্ট? এত কাছে? যুক্তি বারবার বললে, তাই—হ্যাঁ-তাই, তাই! কিন্তু সে কথা কোনমতেই মানতে চাইলে না মন। সে বললে—তবে আমি মহাসত্যকে উপলব্ধির অনুভূতি পেলাম কি করে? আমার সর্বাঙ্গে প্রতিরোমকূপে যে তার স্পর্শের প্রতিক্রিয়া!

এই ঘটনার কথা শুনে আমাদের গুরুবংশের একজন বলেছিলেন, বাবা, তোমার জীবনে সেদিন একটি পরমলগ্ন এসেছিল। তোমার দীক্ষা হয়ে থাকলে তুমি সে দিন পরমবস্তু পেতে পারতে। আমাদের গুরুবংশ বীরভূমের কোতলঘোষা গ্রামের বিখ্যাত তান্ত্রিকের বংশ। ইনি শেষ জীবনে ঘরে থেকেও সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করতেন। মানুষটি ছিলেন বিচিত্র। আমার পিতৃদেব গ্রামপ্রান্তে জনহীন প্রান্তরে মন্দির তৈরী ক'রে তারাপূজার প্রবর্তন করেছিলেন। আশ্বিন মাসে কোজাগরী পূর্ণিমার আগের দিন চতুর্দশীর মহানিশাতে তারাপূজার বিধি। প্রথম পুরোহিত ছিলেন এঁদেরই বংশের একজন; তাঁর পর

এই সতীশ ভট্টাচার্য মহাশয়কে আমিই বরণ করেছিলাম পুরোহিত রূপে। প্রতিবৎসর শারদশুক্লা চতুর্দশীর সন্ধ্যার অব্যবহিত পরেই এই মানুষটি একটি হুঁকা হাতে—কাঁধে ঝোলা ঝুলিয়ে—তারা তারা শব্দ করতে করতে এসে উপস্থিত হতেন, সঙ্গে থাকতেন একজন সঙ্গী। এসে নিজের আসন বিছিয়ে বসতেন। উচ্চকণ্ঠে কথা—উচ্চ কণ্ঠে হাসি; সে কথায়, সে হাসিতে বসতিহীন বিস্তীর্ণ প্রান্তর মুখর হয়ে উঠত। আশ্বিন মাস ঝড়বৃষ্টি দুর্যোগ মাথায় করে আসতেন। আমরা দু একবার উৎকণ্ঠিত হয়েছি—তাঁর আসবার সময় উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে, হঠাৎ একসময় ঝড় বৃষ্টির শব্দ ছাপিয়ে কানে এসে পৌঁচেছে পরিচিত উচ্চ কণ্ঠের ডাক—তারা—তারা!

হঠাৎ একবৎসর তিনি এলেন একা, নীরবে। নীরবে এসে আসন বিছিয়ে বসলেন, কুশল প্রশ্নের উত্তর মৃদুস্বরে সংক্ষেপে দিয়ে নীরব হয়ে বসে রইলেন। বিস্মিত হয়েই আমি কারণ জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি একটু হেসে বললেন—সকল কারণ সকলকে বলা যায় না বাবা! নীরবে বসে তামাক টানতে লাগলেন।

মধ্য রাত্রে শিবাধ্বনি হতেই আমাকে পূজারম্ভের উদ্যোগ করতে বললেন। ঘট এল। তিনি পূজার আসনে দাঁড়িয়ে আসন গ্রহণের পূর্ব মুহূর্তে বললেন, দেখ বাবা, আমার বাড়ী থেকে কোন লোক এলে তাকে অপেক্ষা করতে বলবে। আমাকেও সে সংবাদ দেবে না। কারণ প্রশ্ন কর না।

মনে সন্দেহ জাগল কিন্তু প্রশ্ন করতে পারলাম না। শুধু তাই নয়, অল্পক্ষণের মধ্যে পূজার ব্যবস্থায় কাজে ভুলেও গেলাম এ কথা। লোক অবশ্য এলও না। ওদিকে পূজা শেষ হল, বলিদান হয়ে যাওয়ার পর পূর্ণাহুতি—তিলক ও শান্তিজল-সিঞ্চন-শেষে, মন্ত্রোচ্চারণ করে ঘট বিসর্জন দিয়ে তিনি আমাকে ডেকে বললেন—আগামীবার থেকে তুমি

পূজার পুরোহিতের ব্যবস্থা ক'রো তারাশঙ্কর। আমি এই শেষ পূজা করে গেলাম।

বিস্মিত হয়ে সসঙ্কোচেই প্রশ্ন করলাম—কেন এ কথা বলছেন? কি অপরাধ হ'ল আমাদের?

তিনি প্রসন্ন হাস্য সহকারেই বললেন—না বাবা, অপরাধ নয়। তার জন্যে বলি নি। আজ বোধ হয়—মা আমার বলি গ্রহণ করলেন। এরপর আর তো পূজার বিধি বা প্রয়োজন নেই আমার। আমি চললাম।

তখন রাত্রি প্রায় তিনটা। তিনি বরাবরই পূজান্তে বাকী রাত্রিটা ওই মন্দিরেই শুয়ে থাকতেন। এই রাত্রে চলে যাবেন—তাও একা; যাবেন প্রায় পাঁচমাইল পথ। এর মধ্যে ধান ভরা ক্ষেতের মধ্যে মাইল দুয়েক অতিক্রম করতে হবে। আমার মুখ দেখেই আমার মনোভাব অনুমান করে তিনি বললেন—বাবা, আমার একমাত্র পুত্র, একমাত্র সন্তান, তাকে শেষ শয্যায় দেখে এসেছি। বাড়িতে বলে এসেছিলাম—যাই ঘটুক—লোক পাঠিয়ে যেন আমার পূজার ব্যাঘাত না করে। তবুও যদি পাঠায় সেই ভেবেই বলেছিলাম—লোক এলে আমাকেও সংবাদ দিয়ো না, তাকেও আটকে রেখো। তা তারা আমার কথা রেখেছে। লোক যেন পাঠায় নি। কিন্তু এইবার আমি যাব।

আমি বললাম—আপনি এই অবস্থায় এলেন কেন?

হেসেই তিনি বললেন—না এলে? পূজা? পূজা কে করতো তোমার? দ্বিপ্রহরের পর অকস্মাৎ তার অসুখ উঠল বেড়ে। অকস্মাৎ সমুদ্রে ঝড় ওঠার মত। সে সময়ে লোক পাই কোথায়। তা'ছাড়া—বুঝে নিলাম—এই পূজাতেই মা আমার বলি নেবেন। এ পূজা না করে ঘরে বসে থাকলে পরমফল থেকে বঞ্চিত হব! যাক আমি চললাম।

—লোক! লোক দিই সঙ্গে!

—না।

চলে গেলেন তিনি।

বাড়ি পৌঁছুবার আগেই তাঁর সন্তানের মৃত্যু হয়েছিল।

এই মানুষ একদিন আমাকে এই কথাগুলি বলেছিলেন।

বলেছিলেন—তোমার জীবনে একটি পরমলগ্ন এসেছিল। তোমার দীক্ষা হয়ে থাকলে তুমি দিব্যবস্তু পেতে পারতে।

(চ)

আমি নিজে তখন নব্য পথের পথিক। তন্ত্রে মন্ত্রে বিশ্বাস করি না। কিন্তু জীবনে বংশগত শিক্ষায়, অতীতকে পুরাতনকে অসম্মান করতে কোন কালেই পারি না বা পারতাম না। জানতাম বুঝতাম —অতীতই এখানে এনে পৌঁছে দিয়েছে। পিতৃপিতামহের পথই এসে আমার পথে নব কলেবর লাভ করেছে। নিজেকে সত্যাশ্রয়ী জ্ঞানে—উচ্চ কণ্ঠে তাই জাহির করতে গিয়ে পিতৃপিতামহকে মিথ্যাশ্রয়ী ঘোষণা করার ঔদ্ধত্য আমার কোন কালেই হবে না, তাই সেদিন তাঁর কথা বিশ্বাস করতে না-পারলেও কোন তর্ক তুলি নি। কিন্তু তিনি আমাকে জানতেন। তিনি আমার মনোভাব অনুমান করেই বলেছিলেন—বাবা—এসব তুমি বিশ্বাস কর না তা' আমি জানি। কিন্তু বাবা—রামকৃষ্ণদেব যখন নিজের গলায় খড়্গাঘাত করতে গিয়েছিলেন—তখন সাক্ষাৎ মা এসে দেখা দিয়ে তাঁর হাত চেপে ধরেছিলেন এ ঘটনা তোমার কাছে, বস্তুবাদীর কাছে মিথ্যা হলেও তাঁর কাছে তো মিথ্যা নয়। সে ঘটনা তাঁর কাছে পরম সত্য। যাকে তোমরা—বস্তুবাদীরা বলবে—ভ্রান্তি,

ভ্রম—তাই থেকেই তো তিনি পেলেন পরমসত্যের—পরমেশ্বরীর সাক্ষাৎ। তার ফলে—রামকৃষ্ণদেবের জীবনে যে পরম সমৃদ্ধি তা তো—সকলেই দেখেছে। সকল ফুলের ফল চোখে দেখা যায় না, আবার সকল ফলের ফুলও দেখা যায় না। কিন্তু ফল ধরলে ফুলটা অস্বীকার কর কি করে? জল খেয়ে কেউ যদি বলে অমৃত খেলাম—তা শুনে তুমি হাসতে পার। কিন্তু অমরত্বের লক্ষণ যদি তার মধ্যে প্রকাশ পায়—তখন কি বলবে!

আজ এতকাল পরে এ কথা মানতে কোন সঙ্কোচ নেই। অকুণ্ঠ-চিত্তে স্বীকার করি। সেদিন মনের প্রস্তুতি—সে তন্ত্রশাস্ত্র অনুযায়ী মন্ত্রদীক্ষার ফলেই হোক, আর জীবানুশীলনের অন্যপথে অন্যমতেই হোক, আরও অগ্রসর হয়ে থাকলে সেদিন অরূপের সাক্ষাৎ আমি পেতাম। রূপের ধরণীর মধ্য থেকে তন্ময়তার কল্যাণে অপরূপকে আমি দেখেছিলাম। কিন্তু অপরূপকে অরূপের সঙ্গে এক হয়ে যেতে দেখার মত মনের যোগবল সেদিন আমার ছিল না।

বস্তুবাদী দেখে শুধু রূপকেই। রূপকে কেটে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন ক'রে সেও একপথে অপরূপকে উপলব্ধির চেষ্টা করে। অরূপে সে আজও পৌছুতে পারে নি। কিন্তু অপরূপকে চোখে সে দেখে না—দেখতে পায় না। ভাবুক তা দেখে।

থাক ও কথা।

কিছুক্ষণ বসে থাকতে থাকতেই বিহ্বলতা কেটে গেল। বিভোর মন নিয়ে বাড়ি ফিরলাম। কাকেও কিছু বললাম না।

ঠিক পরের দিন একজন সংবাদ নিয়ে এলে। যাঁর আসবার কথা ছিল তিনি আসতে পারেন নি। অন্যপথে বোলপুর হয়ে চলে গেছেন কলকাতায়।

তারপর কতদিন কতসন্ধ্যায় এসে দাঁড়িয়েছি ওইখানে। প্রতীক্ষা করেছি দীর্ঘক্ষণ। কিন্তু কাউকে দেখিনি। সে বিচিত্র সেই এক লগ্নে এসেছিল, হাতছানি দিয়ে ডেকেছিল, মাঝপথ থেকে আমার অযোগ্যতা অনুভব ক'রে—মৃত্যুভয়ে ভীত ক'রে আমাকে ফিরিয়ে দিয়ে মিলিয়ে গিয়েছে।

তার কিছু ফল সে আমাকে দিয়ে গিয়েছে। সে ফল 'তন্ময়তা' যোগ। তার আস্বাদ আমি পেয়েছি। আমার সাহিত্যজীবনে সাধনকর্মে সে-ই আমার সবচেয়ে বড় সম্বল।

(দ্বিতীয় পর্ব)

(এক)

এই ঘটনার তিন বৎসর পর।

বিচিত্রের প্রকাশ অহরহ, অফুরন্ত; সে নিজেকে প্রকাশ ক'রে চলেইছে, চলেইছে। সেই তো অনির্বচনীয় আনন্দলোক অথবা অনন্ত বেদনালোক যার সংস্পর্শে এলেই মানুষ মুহূর্তে অনুভব করে সে অপার প্রশান্ত প্রসন্নতার মধ্যে অথবা অনন্ত গভীর বিষণ্ণতার মধ্যে মগ্ন হয়ে গেল অথবা যেন গ'লে গেল, মিশে গেল, একাকার হয়ে গেল, বিলুপ্তি ঘটে গেল আত্মসত্ত্বার অথচ কোন শোচনা নাই, কোন ক্ষোভ নাই, কোন বিলাপ নাই। ভয় নাই, বন্ধন, নাই, আশা নাই, ভাষা নাই, গৃহ নাই, আছে শুধু মহানভ-অঙ্গনের মত অনন্তের অঙ্গনতলে সঞ্চরণ। প্রশ্ন থাকে না, অশান্তি থাকে না, কিন্তু চৈতন্য থাকে, অনুভবের প্রকটতা থাকে না, সুগভীর অনুভূতির আস্বাদন থাকে।

কিন্তু মানুষের সঙ্গে সংযোগ তো তার অহরহ ঘটে না, ঘটে কদাচিৎ। ঘটে জীবনের এমনি একাগ্রতার মধ্যে, সর্বসত্ত্বার গভীর আকুলতার মধ্যে, অনেক ক্ষেত্রে বহিপ্রকৃতির আনুকূল্যের মধ্যেও ঘটে। অনন্ত বিশাল সমুদ্রতটে অথবা ধ্যান গম্ভীর মৌন স্থির পার্বত্য প্রদেশে, প্রকৃতি প্রভাবেই অন্তর হয়ে ওঠে ধ্যানমুখী। যে কোন মুহূর্তে যে কোন স্থানে—ক্ষণিক বিরতির সুযোগে ধ্যানমুখী মন মগ্ন হয়ে যায় ধ্যানে। ভিতরে বাহিরে যোগাযোগ ঘটে, অনন্তের মহা অঙ্গন জীবনকে ঘিরে এসে নামে বস্তুময় এই পৃথিবীর উপর। কিন্তু বস্তুময় পৃথিবীর যেখানে জীবন, যেখানে কোলাহল-মুখরতা, জৈব-প্রকৃতির চেতনা যেখানে দ্বন্দ্বকাতর সেখানে এ যোগাযোগ ঘটে কদাচিৎ। আত্মসচেতনাকে অতিক্রম করতে পারে না মানুষ এবং একে অতিক্রম করতে না পারলে ধ্যানযোগ আসে না।

আগের এই ঘটনাটির পর আমার জীবন এমনই ঘটনা-বহুলতার মধ্য দিয়ে চলতে সুরু করলে যে, আবার এ সুযোগ এল তিন বৎসর পর। শুধু তাই নয়, সে কালে এ ঘটনাটিকে দৃষ্টি বিভ্রম বলেই বিশ্বাস করতে চেয়েছিলাম, অস্বীকার করতে চেয়েছিলাম এর প্রভাবকে; মনে মনে নিজেই সেদিনের সেই আমিকে বারবার ব্যঙ্গ করে বিদ্ধ করতে চেয়েছিলাম। যারা হিমালয়ের নির্জনতায় এই মহাঅঙ্গনকে সন্ধান করতে যায়, সমুদ্রতটে ব'সে নিরবধি দিক্‌চক্রবালে সমুদ্র ও আকাশের মিলনরেখায় অসীমের সন্ধান ক'রে তাদের অনন্তবিলাসী ব'লে রহস্য করি, এমনি তখন আমার মনের গতি।

আইন-অমান্য-আন্দোলন—সভা-সমিতি—গ্রেপ্তার—কারাদণ্ড একের পর এক এসে গেল দ্রুততম গতিতে। জেলখানা ছিল একটি অনুকূল স্থান যেখানে এই ধ্যানযোগের সাধনা করা যেতে পারত। কিন্তু উনিশ শো তিরিশ সাল একটি ঐতিহাসিক সাল—সে শুধু জাতীয় আন্দোলনেই একটি মোড় ফেরায় নি, আমাদের রাজনৈতিক কর্মীদের চিন্তাধারায়, বিশ্বাসের পথেও মোড় ফিরিয়েছিল। ইউরোপীয় শক্তির কাছে যত আঘাত খাচ্ছি, ততই জোরে আমরা আঁকড়ে ধরছি ইউরোপের বস্তুবাদকে। মার্কসবাদের আলোচনায় আন্দোলনে জেলখানা তখন মুখর। মহাঅঙ্গন অভিমুখে ফুৎকার নিক্ষেপ করার প্রবৃত্তি তখন ঘাড়ে চেপে বসেছে—ব্যর্থতার আক্রোশে। জেল-খানাতেও এ চিন্তার অবকাশ ছিল না।

জেলখানায় কারাজীবনের শেষ দিকে এর উপর এল একটা বিতৃষ্ণা। বিতৃষ্ণা এল দলবাঁধার কদর্যতা দেখে। সে কথা এখানে থাক্। মুক্তিকালে সংকল্প নিয়ে বেরিয়ে এলাম, সকল দলের কাছ থেকে দূরে থেকে সাহিত্যের মাধ্যমে বলব আমার বলার কথা, বাইরে নয়—মানুষের মনের ভিতর খুঁজে নেব আমার কর্মক্ষেত্র। উনিশ শো

একত্রিশ গেল—বত্রিশ সালে অকস্মাৎ জীবনে এল একটা প্রচণ্ড আঘাত। জীবনে হ'ল প্রথম সন্তান-বিয়োগ। আমার প্রিয়তমা কন্যা বুলা মারা গেল অকস্মাৎ। এই আঘাতে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। অশান্তিতে বেদনায় জীবনটা যেন ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। অশান্ত চিত্তে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম দেশময়। গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে; মেলা থেকে মেলায়; সান্ত্বনা খুঁজতে চেষ্টা করলাম সাহিত্যের মধ্যে। মনের মধ্যে প্রচণ্ড দ্বন্দ্ব বাধল—বস্তুবাদ-বিশ্বাসে এবং প্রেততত্ত্ববাদে। 'বঙ্গশ্রী' আপিসে স্বর্গীয় বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রেততত্ত্ব আলোচনায় আমার মনের সুপ্ত কৌতূহল এবং বিশ্বাসকে নতুন ক'রে জাগিয়ে তুললেন। অনেক কাল আগে, বোধ করি, তেইশ চব্বিশ সালে আমি নিজে হাতে-কলমে প্রেততত্ত্ব আলোচনা করেছিলাম। দু-তিনবার প্রেত আহ্বানচক্রের অনুষ্ঠান করেছিলাম এবং নেতৃত্ব করেছিলাম আমি। সে সময় প্রেততত্ত্বের বই পড়েছিলাম নিছক কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে এবং পরীক্ষা করবার জন্য অনুষ্ঠানের প্রথম চক্রেই বিস্মিত ও অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম প্রেতাত্মার আবির্ভাবে। আমাদের গ্রামের প্রতুল মুখোপাধ্যায় আশ্চর্য রকমের মিডিয়ম ছিল। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তার আচ্ছন্ন অবস্থা আসত এবং মিডিয়মের মুখে পরিচিত প্রিয়জনের আত্মার যে সব মমতাকাতর উক্তি এবং বিস্ময়কর অজ্ঞাত গোপন সংবাদ শুনেছিলাম তাতে অবিশ্বাস করার উপায় ছিল না। আমি কিন্তু ঠিক এই কারণেই এ চর্চা এইখানে স্থগিত রেখেছিলাম। ওতে আমি বিশ্বাস করতে চাই না। বিশ্বাস করব না। দীর্ঘকাল পর সন্তান-শোকের বেদনায় আবার ওই প্রেততত্ত্ববাদের মধ্যে খুঁজতে গেলাম সান্ত্বনা—যদি বুলার দুটো কথা শুনতে পাই, যদি সে কোন কথা বলে!

কলকাতায় অনেক বৈঠকের সন্ধান করলাম, পেলাম না। সবগুলিই প্রায় উঠে গেছে। দু-এক ক্ষেত্রে মিডিয়ামের অভাবের কথা শুনলাম। শুনে আমি প্রতুলকে সংগ্রহের চেষ্টা করলাম কিন্তু তাতেও ব্যর্থ হতে হ'ল। সে-কালের চক্রে বসে মিডিয়ম হয়ে প্রতুলকে নিষ্ঠুর দৈহিক যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছিল। সে যেন একটা নিদারুণ প্রহার, তারই ফলে প্রতুলের হয়েছিল আতঙ্ক। এবং এই বর্তমান সময়ে প্রতুলের দেহও ছিল খুব অসুস্থ। পেটের মধ্যে একটা অপারেশন হয়েছিল বোধ হয়। আর তখন যেন অল্প অল্প হাঁপানীতেও কষ্ট পায় মাঝে মাঝে। সুতরাং প্রতুল রাজী হ'ল না।

অতৃপ্ত অশান্ত শোকার্ত চিত্তে আমি সান্ত্বনা খুঁজে ফিরতে লাগলাম শ্মশানে, বুলার খেলাঘরে, খেলার প্রিয় স্থানগুলিতে। লাভপুরেই তখন থাকি, মধ্যে মধ্যে কলকাতা আসি যাই। লাভপুরে যখন থাকি তখন সন্ধ্যায় শ্মশানে গিয়ে বুলার চিতার পাশে ব'সে থাকি। জনহীন অন্ধকার শ্মশানের প্রতিটি শব্দ আমাকে সচকিত ক'রে তোলে, মনে হয়, বুঝি বুলা দিল সাড়া, এইবার তাকে দেখতে পাব, দৃষ্টি বিস্ফারিত ক'রে চারিদিক খুঁজি ; কিন্তু কোথায় কি ? কতদিন গভীর রাত্রে ঘর থেকে বেরিয়ে আসি সন্তর্পণে—বুলার খেলার ঠাঁইগুলির কাছে এসে বসি, নিষ্পলক চোখে চেয়ে থাকি, নিজের বুকের শ্বাসপ্রশ্বাস গণনা করি, রাত্রি শেষ হয়ে আসে, বুকের বোঝা দ্বিগুণিত হয়ে ওঠে, সেই বোঝা নিয়ে ফিরে বিছানায় এলিয়ে পড়ি। কতদিন কেঁদেছি।

এমনি অবস্থায় একদিন শ্মশান থেকে ফেরার পথে আমাদের গ্রামের দেবস্থল বাংলা দেশের একান্ন মহাপীঠের অন্যতম মহাপীঠ—ফুল্লরা-মায়ের আশ্রমে ঢোকবার মুখে এক গম্ভীর কণ্ঠের ধ্বনি শুনে ফিরে দাঁড়ালাম। ফুল্লরা দেবীর আশ্রম—গ্রামের প্রান্তে এক নির্জন প্রান্তরে—অরণ্যসমাবেশের মধ্যে মনোরম একটি স্থান।

আশ্রমের দক্ষিণ দিকে নদী পর্যন্ত বিস্তীর্ণ প্রান্তর, আমি এই দক্ষিণ দিক থেকে আশ্রম-প্রবেশের পথের ঠিক মুখেই ওই কণ্ঠস্বর শুনে ঘুরে দাঁড়ালাম। অন্ধকারে দেখলাম, দূরে দীর্ঘাকৃতি—প্রায় ছ ফুট লম্বা খাড়া সোজা একটি মানুষ, একটি জ্বলন্ত কাঠ হাতে চ'লে আসছেন এই আশ্রমের দিকে। বুঝলাম, সাগ্নিক কোন সন্ন্যাসী। জীবনে সন্ন্যাসগ্রহণের সময় যে যজ্ঞাগ্নি প্রথম প্রজ্বলিত করেছেন, সেই অগ্নিকে আজীবন বহন ক'রে নিয়ে চলেছেন এবং মলমূত্র ত্যাগের সময় ছাড়া অন্য কোন সময়েই ওই অগ্নির সঙ্গে সংস্পর্শ ছিন্ন করেন না। স্থান থেকে স্থানান্তরে চলেন—এমনিভাবেই কাষ্ঠখণ্ডের মুখে অগ্নিকে গ্রহণ ক'রে বহন ক'রে নিয়ে চলেন; যেখানে আসন গ্রহণ করেন—সেখানে এই অগ্নিকে প্রথম স্থাপন করেন নূতন সমিধ। দীর্ঘাকৃতি সন্ন্যাসী আমাকে দেখে দাঁড়ালেন। আগেই দেখেছিলাম তাঁর দৈর্ঘ্য এবং ঋজু গঠনভঙ্গি; এখন দেখলাম মাথার চুলগুলি একবারে শুভ্র এবং ছোট ক'রে ছাঁটা; মুখে চাপদাঁড়ি, গোঁফ, সেগুলিও সাদা হয়ে গেছে। আমাকে পেয়ে বললেন, এই কি ফুল্লরা দেবীর আশ্রম?

—হ্যাঁ বাবা। কোথা থেকে আসছেন?

—বহুৎ দূর থেকে বাবা।

ব'লেই আমাকে পাশ কাটিয়ে ঘন বনের মধ্যে সংকীর্ণ পথটি ধ'রে আশ্রমের দিকে এগিয়ে গেলেন। আশ্রমের মধ্যে মন্দিরে তখন আরতির কাঁসর-ঘণ্টা বাজছে। আমি ওই প্রবেশ পথের ধারেই বাঁধানো বেলগাছের তলায় বসলাম। এখন ওখানে অনেক লোক—অনেক ভক্ত। আরতি শেষ হ'লে ওখানে যাব।

ভিতরে গেলাম যখন, তখন আরতি শেষ হয়েছে। লোকজন প্রায় সকলেই চ'লে গেছেন। শুধু মন্দিরের পূজককে দেখলাম বিব্রত

হয়ে ঘুরতে ; শুনলাম, বলছেন—এ আমি একা কি করব ? কোথায় কি পাব ?

আশ্রমের ব্যবস্থায় তখন ঘোরতর বিশৃঙ্খলা চলছিল। ওখানকার কোন রক্ষক বা ব্যবস্থাপক কেউ নেই বললেই চলে। মহান্ত নেই। পূজকেরা আসেন—পূজা করেন, যা আসে পূজার দ্রব্য বেঁধে নিয়ে সন্ধ্যায় চ'লে যান, আশ্রম খাঁ খাঁ করে। সাধুসন্ন্যাসীরা এসে আশ্রয় পান না। মন্দির ছাড়া সাধুসন্ন্যাসীদের জন্য নির্দিষ্ট ঘরদুয়ারগুলি অপরিচ্ছন্ন। আশ্রমের গোয়ালঘর ভেঙে যাওয়ায় কয়েকখানা ঘরে গরু ছাগল থাকে। বাকি কয়েকখানায় অবাধে বিচরণ করে এই ঘন অরণ্যের সরীসৃপেরা। মন্দিরের পিছন দিকে এই ঘরগুলির উঠানে গিয়ে দেখলাম, একখানা পাথরের উপর পা রেখে সেই জ্বলন্ত কাঠখানি হাতে সন্ন্যাসী দাঁড়িয়ে আছেন—নীরব হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন অধীরতা নেই এক বিন্দু, চেয়ে রয়েছেন রক্তিম আকাশের দিকে।

পূজক বললেন, কি বিপদ দেখুন তো! এই রাত্রিতে সন্ন্যাসী এসে হাজির। বললাম—এখানে নানান অব্যবস্থা, তার থেকে চলুন গ্রামের মধ্যে বাবুদের কোন ঠাকুর-বাড়িতে থাকবেন। তা উনি যাবেন না। বলেন—এখানে ঠাঁই আমার চাই-ই। এইখানেই কয়েকদিন থাকব ব'লেই আমি এসেছি। নেহাত না পাই, আমার দুসরা ঠাঁইয়ের জন্য তোমাকে চিন্তা করতে হবে না। ওই চাতালটা দেখিয়ে দিয়ে বললেন—ওইখানে আমার ঠাঁই ক'রে দাও আর কিছু কাঠ এনে দাও। কি খাবেন জিজ্ঞাসা করলাম তো বললেন—দুধ। এখন আমি একা কি করি বলুন ? সব লোক একে একে খ'সে পড়ল। মায়ের স্থানের মাহিন্দার বেটাও পালিয়েছে।

আমি আর একবার তাকিয়ে দেখলাম সন্ন্যাসীর দিকে। মনে শ্রদ্ধা হ'ল বললে সবটা বলা হবে না। মানুষটিকে দেখে আমি যেন

ক্রমশ অভিভূত হয়ে পড়ছিলাম। মনে হচ্ছিল, আমি যা খুঁজছি, এঁর কাছে হয় তো পাব।

পূজককে বললাম, চলুন, আমি সাহায্য করছি।

—আপনি?

—হ্যাঁ, আমি। চলুন।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরিশ্রম ক'রে সন্ন্যাসীর সমস্ত ব্যবস্থা ক'রে ফেললাম। চাতাল পরিষ্কার হ'ল, রাশীকৃত শুকনো গোবর, শুকনো পাতা, ছাগলের বিষ্ঠা পরিষ্কার করলাম। কাঠ সংগ্রহ ক'রে দিলাম। অন্য ব্যবস্থা যা কিছু যথাসাধ্য ক'রে দিলাম। সন্ন্যাসী আসন গ্রহণ করলেন। আগুনের উপর কাঠ দিয়ে জ্বালিয়ে দিলেন অগ্নি। একখানি কাঠকে স্পর্শ ক'রে তিনি বসলেন।

এতক্ষণে সেই আগুনের আলোয় সেই সন্ন্যাসীকে ভাল ক'রে দেখলাম। পশ্চিম দেশীয় মানুষ। সে তাঁর ভাষা থেকেই বুঝেছিলাম। বয়স আশি বা আশির উর্ধে তাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু আশ্চর্য পেশী-সবল দেহ এবং চোখে আশ্চর্য দৃষ্টি। স্থির এবং কোন দূর-দূরান্তরে নিবদ্ধ যেন সে দৃষ্টি।

আমি ব'সে রইলাম কাছে। একটা পিপাসা যেন মুহূর্তে মুহূর্তে বেড়ে চলেছে! অন্তর যেন আকুল হয়ে উঠেছে। এমনি মানুষই যেন আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি।

সন্ন্যাসী আমার দিকে না-তাকিয়েই প্রশ্ন করলেন, ব'সে কেন বাবা?

মুখ থেকে বেরিয়ে গেল, আপনার আর কিছু প্রয়োজন আছে?

—না বাবা। আর কি প্রয়োজন থাকবে? কিছু প্রয়োজন নেই।

আবার কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলাম দুজনেই। তারপর অকস্মাৎ ব'লে ফেললাম, আমাকে আপনি দীক্ষা দেবেন বাবা? আমার অন্তর বড় ব্যাকুল হয়েছে।

সন্ন্যাসী আমার দিকে ফিরেও চাইলেন না, যেমন চেয়েছিলেন সেই অগ্নিকুণ্ডের দিকে তেমনিই তাকিয়ে রইলেন; শুধু ঠোঁট দুটি নড়ল, আমি শুনলাম তিনি বললেন—সুধা রাখতে হ'লে স্বর্ণপাত্র চাই বাবা, মৃৎপাত্রে হয় না। হিরণ্ময়েন পাত্রেন—

মুহূর্তে আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত এ কালের শিক্ষার মর্যাদাবোধ বিদ্যুদ্দীপ্তির মত একটা দাহ ছড়িয়ে চকিতে খেলে গেল। মাথাটা খাড়া সোজা হয়ে উঠল। তবুও আমি তাঁকে কোন উদ্ধত প্রত্যুত্তর দিলাম না। বাধা দিলে আমার কুলগত শিক্ষা। সঙ্গে সঙ্গে উঠলে তাঁর অসম্মান করা হবে ভেবে সঙ্গে সঙ্গে উঠলাম না। মিনিটখানেক অপেক্ষা ক'রে ধীরে ধীরে উঠলাম, বললাম—নমো নারায়ণায় বাবা।

—নমো নারায়ণায়।

সন্ন্যাসী সেই অগ্নিকুণ্ডের দিকেই তাকিয়ে রইলেন। চোখের মধ্যে অগ্নিচ্ছটার প্রতিচ্ছটা জ্বলছে।

আমি চ'লে এলাম।

কি হবে আমার সেই সুধায়, যে সুধা স্বর্ণপাত্র ব্যতীত ক্ষয় হয়, দূষিত হয়? যে অমৃত মৃৎপাত্রকে অক্ষয় এবং শুচি করতে না পারে, সে আবার অমৃত কিসের?

আর আমিই বা মৃৎপাত্র কিসে? কেন?

রক্তমাংসের এই জরা-মরণশীল দেহের আধারে আমার আত্মা যে তপস্যার হোমাগ্নি জ্বেলেছে তার স্বরূপ তো আমি জানি। সে তো সম্পদ চায় নি, সে তো স্বার্থ চায় নি, সুখ চায় নি, সে হোমাগ্নি আমার জীবনকে দহন করছে সুতরাং আমি মৃৎপাত্র কিসে? কেন?

প্রশ্ন করেছিলাম নিজেকেই। উদ্ধত হয়ে প্রশ্ন করি নি। যাচাই করেছিলাম।

ধীরে ধীরে বাড়ি ফিরে এলাম।

এর পর সন্ন্যাসীটির কথা মন থেকে প্রায় মুছে গেল।

কঠোপনিষদে আছে নচিকতা যমের কাছে উপস্থিত হয়ে জানতে চেয়েছিলেন—

'যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে
অস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে,
এতদ্বিদ্যামনুশিষ্ট ত্বয়াহং।'

—মানুষের মৃত্যু হ'লে অস্তি ও নাস্তি অর্থাৎ মৃত্যুর মধ্যেই অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না—এই নিয়ে সংশয় রয়েছে মানুষের মনে; এই তত্ত্ব সম্পর্কে, হে মৃত্যো, আপনার কাছে পরম সত্যকে আমি জানতে চাই।

মানুষের মনে এ জিজ্ঞাসা সকল মানুষের মনের মধ্যেই আছে, কখনও অন্য বহু প্রশ্ন বা বাইরের কোলাহলের মধ্যে ঢাকা প'ড়ে থাকে, কখনও জেগে ওঠে নানা রূপ পরিগ্রহ ক'রে। কদাচিৎ এ প্রশ্ন জেগে ওঠে আকুল তৃষ্ণার মত। আকুল তৃষ্ণা বলছি তাকেই, যে তৃষ্ণা জলের পরিবর্তে অন্য কোন পানীয়ে নিবারিত হয় না।

যম নচিকেতাকে এ তত্ত্বের সত্যের পরিবর্তে দিতে চেয়েছিলেন যা কাম্য, যা দুর্লভ তাই। বিত্ত, সম্পদ, সুখদায়িনী অপ্সরা, আরও অনেক কিছু। ইঙ্গিতে বলেছিলেন—এই বাদ্যযন্ত্রধারিণী রমণীয় অপ্সরাবৃন্দ নৃত্যগীতে তোমাকে স্বপ্নাচ্ছন্ন ক'রে রাখবে। এ প্রশ্ন তুমি ভুলে যাবে।

নচিকেতা বলেছিলেন—'ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যো।' আর বলেছিলেন 'শ্বোভাবা মর্ত্যস্য যদন্তকৈতৎ, সর্বেন্দ্রিয়াণাং জরয়ন্তি তেজঃ।'

মৃত্যু-রহস্য সম্পর্কে যখন প্রশ্ন জাগে, তখন মানুষের মন এমনি একাগ্র হয়েই ওঠে। সে ছুটে চলে পাগলের মত ওই রহস্য

জানবার পথে। ভুলে যায় অন্য সব কিছু। আমিও ভুলে গেলাম কয়েক দিনের মধ্যেই এই সন্ন্যাসীর কথা। না, ভুলে গেলাম ঠিক নয়। আমার অহংবোধ বিলুপ্ত হয় নি, তাই সন্ন্যাসীটির কথা ঠিক ভুলি নি। তবে সাবধানতা অবলম্বন করলাম, ওই দেবস্থানে যাওয়া বন্ধ করলাম। তাঁর কাছ থেকে অমৃতের প্রত্যাশীও আমি নই, বিষেরও নই। যা জানতে চাই—আপন সাধনায় সম্ভব হ'লে জানব, নইলে জানা হবে না।

দেবস্থানটিকে বাঁ দিকে রেখে নিয়মিত চ'লে যেতাম শ্মশানে। সেখানে ব'সে চিন্তা করতাম। সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরতাম। কোন কোন দিন শ্মশান থেকে ফিরেও গ্রামপ্রান্তে আমাদের নিজেদের বাগানে ব'সে থাকতাম। এমনি ভাবেই চলছিল দিন। দিন দশেক পর একদিন ওই ফুল্লরা দেবীর আশ্রমের প্রয়োজনেই ওখানে যেতে হ'ল। তখন আশ্রমের বিশৃঙ্খলার জন্য গ্রামের লোকেরা মিলে একটি পরিচালক-সমিতির মত সমিতি গড়েছিলেন, সেই সমিতির মধ্যে আমিও ছিলাম। শ্মশানে সেদিন আর যাওয়া হ'ল না। স্থির করলাম, সমিতির কাজের শেষে ওখান থেকেই যাব সেখানে।

ফুল্লরা দেবীর আশ্রমে গিয়ে সে দিন বিস্ময় বোধ না ক'রে পারলাম না। দেখলাম বহুলোকের সমাবেশ। প্রবেশ পথেই দেখলাম গ্রাম-গ্রামান্তরের পাঁচ সাতজন লোক আশ্রমে প্রবেশ করছেন। অথচ দীর্ঘদিন ধ'রে আশ্রমের বিশৃঙ্খলা হেতু এখানে লোকজন বড় আসে না। দু একটা কথা কানে এল—সন্ন্যাসী সাধু। ভিতরে ঢুকে দেখলাম, আশ্রমে সাধুদের জন্য নির্দিষ্ট সেই ঘরটির চাতাল বারান্দা লোকে ভ'রে গেছে। মাঝখানে ব'সে আছেন সে দিনের সাধু। দিনের আলোতে তাঁকে

দেখলাম। হ্যাঁ, বয়স কখনই আশির কম নয়। কালের অলঙ্ঘনীয় আদেশে দেহে জরা এসেছে, কিন্তু সে জরা সম্ভ্রমভরে বিনম্র। মাথার চুল ও মুখের দাড়ি। গোঁফের শুভ্রতায়, দেহ-চর্মের ঈষৎ শিথিলতায়, পাংশু বিবর্ণতায় বরং যেন প্রসন্নতাই এনে দিয়েছে ব্যক্তিটির সর্বাঙ্গে। দৃষ্টি তাঁর ওই প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডেই নিবদ্ধ। সমবেত জনতার মধ্য থেকে প্রশ্ন হচ্ছে, কোনটার উত্তর দিচ্ছেন, কোনটার দিচ্ছেন না। আমি একটা নমস্কার জানিয়েই সেখান থেকে স'রে গিয়ে দাঁড়ালাম মন্দিরের সম্মুখে। হঠাৎ আমার কাছে ছুটে এল একজন, বললে, আপনাকে ডাকছেন গো সাধুবাবা।

বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলাম, আমাকে?

—হ্যাঁ, আপনাকে। কদিনই বলছেন। বলছেন—প্রথম দিনই তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। কই, সে তো আর এল না? পুরোহিত বললে—সে আপনি। আজ আপনি চ'লে এলেন, আমি বললাম, বাবা আপনি খোঁজ করছিলেন সেই তারাশঙ্করবাবু এসেছেন আজ। বললেন—ডাক।

মনটা কেমন যেন ভ্রূকুটি ক'রে উঠল। আমার অহংবোধ জেগে উঠল। বললাম, যাও তুমি, পরে যাব আমি।

সে চ'লে গেল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই ফিরে এসে বললে, না আপনি আসুন। বললেন—এখুনি আসতে বল।

এখুনি আসতে বল? আচ্ছা, চল। উঠলাম, এসে দাওয়ার সামনে দাঁড়িয়ে যুক্ত করে আবার নমস্কার জানিয়ে বললাম, আমায় ডেকেছেন বাবা?

সন্ন্যাসী তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন, তারপর যেন কৈফিয়ৎ জিজ্ঞাসার সুরেই বললেন, তুমিই সে দিন আমার কাছে দীক্ষা নিতে চেয়েছিলে?

নিজেকে সংযত করলাম, তাঁর মর্যাদা রেখে সম্ভ্রমের সঙ্গেই বললাম,—হ্যাঁ। সে কথা আপনার মনে আছে ?

আছে। কণ্ঠস্বরের তারটি যেন চড়া পর্দায় টেনে বাঁধলেন তিনি। বললেন, কিন্তু কই, তারপর তো তুমি আর এলে না ?

মনে আছে মিনিটখানেক স্তব্ধ হয়ে ছিলাম। তারপর ধীর সংযত কণ্ঠে বললাম,—আর তো প্রয়োজন বোধ করি নি।

—প্রয়োজন বোধ কর নি ?

—না। আপনি সেদিন আমাকে বলেছিলেন—সুধা রাখতে হ'লে স্বর্ণপাত্রের প্রয়োজন হয়, মৃৎপাত্রে হয় না বাবা। স্পষ্টতই আমাকে আপনার মৃৎপাত্র মনে হয়েছে। সুতরাং সুধা আমি পাব না। সে ক্ষেত্রে আমি এসে কি করব বাবা ? তা ছাড়া—

চকিত হয়ে উঠল সমবেত জন-সমাবেশ।

বৃদ্ধ সোজা হয়ে বসলেন। দৃষ্টি তাঁর মর্মভেদী হয়ে উঠল।

আমি বললাম, কিছু মনে করবেন না বাবা। আমি একটি গল্প মনে ক'রে সাবধান হয়েছি। সেই জন্যই আসি নি।

—সে কি গল্প ?

—একটি নদীতে একটি মৃৎপাত্র আর একটি স্বর্ণপাত্র ভেসে যাচ্ছিল। স্বর্ণপাত্র মৃৎপাত্রকে ডেকে বলেছিল—ওহে মৃৎপাত্র, এস একসঙ্গে পাশাপাশি ভেসে যাই। মৃৎপাত্র বলেছিল—হে স্বর্ণপাত্র, আমাকে মার্জনা কর, কারণ উভয়ে আকারে এক হলেও উপাদানে পৃথক ; একসঙ্গে ভেসে যাওয়ার পথে তোমার সঙ্গে যদি কোনক্রমে আমার সংঘর্ষ হয় তা'হলে আমার ধ্বংস অনিবার্য। সেই আশঙ্কাতেই দূরে স'রে গিয়েছি বাবা। আর যে সুধা পাত্রের উপাদানের তারতম্যে অশুচি হয়, গুণভ্রষ্ট হয় সে হয়তো উৎকৃষ্ট রসায়ন হতে পারে, কিন্তু সে সুধা সত্যকারের সুধা অর্থাৎ অমৃত—যাতে মৃত্যুকে জয়

করা যায়, তার রহস্য ভেদ করা যায়, সে বস্তু নয়। তার আকাঙ্ক্ষা আমার নেই। আমার না-আসার কারণ তাও বটে।

আমার কথায় সমবেত লোকগুলি স্তম্ভিত হয়ে গেল। এই সন্ন্যাসীকে দেখে যে মানুষেরা ভয়ে ভক্তিতে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে আসে, বসে, দেখে, তাঁর কথা শোনে, তাদের স্তম্ভিত হওয়ারই কথা। এই মানুষটি কি পারেন, কি জানেন তার হিসেব খতিয়ে না ক'রেও তাঁর একটি সম্পদের কথা প্রত্যক্ষ। এই মানুষটি জরাকে শাসন করতে জানেন, আয়ুকে পরমায়ু করতে জানেন, মৃত্যুকে দূরবর্তী করতে জানেন। এই কয়েকটি সম্পদই যে জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। সেই মানুষের সঙ্গে এমন ভাবে প্রত্যুত্তর করে এই ছন্নমতি ব্যক্তিটি কোন্ সাহসে? আমি তখন সমাজে সংসারে ছন্নমতি ব'লেই সর্বজনবিদিত। সংসারে অনাসক্ত, বিষয় ব্যাপারে সম্পর্কহীন, রাজসরকারের প্রসাদ আমি মাটিতে নিক্ষেপ করেছি; সুতরাং আমি ছন্নমতি ছাড়া আর কি! তারা আমার মুখের দিকে একবার তাকালে, তার পরই সে দৃষ্টি তাদের নিবদ্ধ হ'ল সন্ন্যাসীর মুখের উপর। এইবার নিশ্চয় হবে অগ্ন্যুদ্গার।

কিন্তু সন্ন্যাসী স্তব্ধ হয়েই রইলেন, তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আমার মুখের উপরেই নিবদ্ধ হয়ে রইল। আমিও দাঁড়িয়ে রইলাম তাঁর উত্তর শুনবার জন্য। সন্ন্যাসী কোন উত্তরই দিলেন না, আমার মুখের উপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে তাঁর সম্মুখের অগ্নিকুণ্ডের দিকে নিবদ্ধ করলেন। আমি এইবার পা বাড়িয়ে বললাম, নমো নারায়ণায়। সন্ন্যাসী দৃষ্টি না ফিরিয়েই হাতখানি ঈষৎ উত্তোলিত ক'রে প্রত্যভিবাদন জানালেন, নমো নারায়ণায়। সন্ন্যাসীর প্রণাম গ্রহণে অধিকার নেই, সন্ন্যাসী কোন ব্যক্তিকেও প্রণাম করেন না। সেই কারণে প্রণাম জানাতে হয় তাঁর অন্তরস্থ নারায়ণকে, প্রত্যভিবাদনে তিনিও

নতি জানান অভিবাদনকারীর অন্তরস্থ নারায়ণকে। অহংয়ের স্থান এখানে নেই।

আমি চ'লে গেলাম। গিয়ে বসলাম শ্মশানের ধারে। বিশ্লেষণ করলাম, বার বার বিশ্লেষণ ক'রে দেখলাম, আমার এই বাক্যালাপের ন্যায় অন্যায়। কণ্ঠস্বরের ভঙ্গির কথা স্মরণ ক'রে বিচার করলাম, না, অন্যায় কথা আমি বলি নি। রূঢ়তা আমার ছিল না। মৃৎপাত্র ও স্বর্ণপাত্রের উল্লেখের মধ্যে যে শ্লেষটুকু আছে সেটুকু স্বাভাবিক অধিকারেই এসেছে, তিনিই আমাকে মৃৎপাত্র বলেছেন সর্বাগ্রে।

এই ঘটনার পর প্রায় মাস পাঁচেক চলে গেল।

সন্ন্যাসী আর কয়েক দিন এখানে থেকে চ'লে গেলেন, আবার এলেন, আবার গেলেন, আবার এলেন। ধীরে ধীরে তাঁর একটি ভক্তমণ্ডলী গ'ড়ে উঠল। সে ভক্তদলের মধ্যে নারী পুরুষ সবই ছিল। এ সংসারে যাদের জীবনে বঞ্চনা যত বেশি, সে বঞ্চনার প্রতিকারে যারা যত অসহায় তারাই তত আকুলতার সঙ্গে খুঁজে বেড়ায় মহৎ এবং শক্তিশালী আশ্রয়। এ দেশের লোক সে দিনও বিশ্বাস করত, যোগ-বিভূতি-সম্পন্ন সন্ন্যাসীই সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তিশালী, ঐ বিভূতিই শ্রেষ্ঠ মহত্ত্ব। আজও অল্পবিস্তর আছে সে বিশ্বাস। রাজনৈতিক নেতারা অনেক পরিমাণে এই সন্ন্যাসীদের স্থান অধিকার করেছেন। তাঁদের পরিচালনায় মূঢ়ের মত মিছিলে সভায় এ দেশের মানুষ ভিড় করে বটে—তবুও তারাই ওই মিছিল থেকে ফেরার পথে সন্ন্যাসীর আস্তানা দেখলে সেখানে ব'সে পড়ে। মনোবেদনা জানায়।

এই কারণেই স্বাভাবিক ভাবেই জীবনে বঞ্চিতা দুঃখিনী মেয়েরা তাঁর কাছে যেতেন, বিধবারা যেতেন। তাঁদের সঙ্গে যেতেন একটি মেয়ে, তাঁর নাম ছিল গোপাল দাসী, ডাকনাম ছিল গুপ্‌লি। গুপলি

ছিল আমারই সমবয়সী, হয়তো দু-এক বছরের বড়। কুলীনের ঘরের স্বামী-ঘর-বঞ্চিতা মেয়ে। প্রথম জীবনে বিবাহের পরই কয়েক বৎসর স্বামী আসতেন যেতেন; দুটি সন্তান হয়েছিল, প্রথমটি চার বছর বয়সে ফুটন্ত দুধের কড়াইয়ের মধ্যে প'ড়ে গিয়ে পুড়ে মারা যায়, অবশিষ্ট একটি সন্তান। বর্তমানে স্বামী আর আসেন না, চিঠিপত্রেও সংবাদ নেই, পিত্রালয়ে বাপ-মাও গত হয়েছেন তখন, ত্রিসংসারে ওই সন্তানটি ছাড়া আপনার জন কেউ নাই। সে সন্তানটিও নাবালক, বছর পনের বয়স। পৈতৃক সম্পত্তি যৎসামান্য, তাতে নিতান্ত দুঃখে কষ্টেই সংসার চলে। এই মেয়েটিও এই ভক্তমণ্ডলীর দলে ছিল। নিয়মিত যেত, আসত।

সন্ন্যাসী যখন সন্ন্যাস নেয়, তখন তাকে সব ত্যাগ করতে হয়। পরলোক, ভূলোক, ভুবলোক পর্যন্ত ত্যাগ করতে হয়। ইহলোকের মায়া-মমতা তো বটেই। কিন্তু মানুষ চিরকালই মানুষ, সন্ন্যাসীও মানুষ—মানুষের সংস্পর্শে এসে নিরাসক্ত থাকতে যথাসাধ্য চেষ্টা ক'রেও কোন দুর্বল মুহূর্তে কার মায়ার বন্ধনে যে ধরা দিয়ে বসে সে কথা সে নিজেই বুঝতে পারে না। যখন জানতে পারে তখন সে বাঁধা পড়ে গেছে। তখন আর স'রে যাবার সময় থাকে না। এই অশীতিপর বৃদ্ধও এই আসা-যাওয়ার মধ্যে কখন বাঁধা পড়ে গিয়েছিলেন এই দুঃখিনী মেয়েটির মমতায়।

বড় মধুর প্রকৃতির মেয়ে ছিল গোপালদাসী; দেখতেও ছিল শ্রীমতী মেয়ে। হয়তো বা একটু কম ক'রে বলা হ'ল; গোপালদাসীকে সুন্দরী বলা চলত। এবং এমন হাস্যমুখী মেয়ে আমার জীবনে দু-চারটির বেশি আমি দেখি নি। তার হাসি ছিল জলের তরঙ্গের মত। মেয়েটি নিত্যই প্রত্যূষে যেত ফুল্লরা দেবীর মন্দিরে; আরও মহিলারা যেতেন; দেবীকে প্রণাম ক'রে সন্ন্যাসীর

আসনের সম্মুখে দাঁড়িয়ে থাকত কিছুক্ষণ, তারপর একটি প্রণাম জানিয়ে চ'লে আসত। সন্ন্যাসী সেই প্রত্যুষেই প্রাতঃকৃত্য থেকে স্নান পর্যন্ত শেষ ক'রে হোম শেষ করতেন; চোখ ফিরিয়ে কারুর দিকে তাকাতেন না। কিছুদিন পর মেয়েরা এই সন্ন্যাসীর কথা শোনবার জন্য দ্বিপ্রহরের শেষভাগে যেতে আরম্ভ করলেন। স্বল্পবাক্ সন্ন্যাসী বারণ করতেন না এবং যেতেও বলতেন না। তবু মেয়েরা যেতেন। এরই মধ্যে একদা প্রত্যুষে মেয়েরা দেখলেন, সন্ন্যাসী অসুস্থ। আসনে শুয়ে আছেন, উঠতে পারেন নি। পরের দিনও তাই। পুরোহিত বিব্রত হয়েছেন। তিনি বললেন—ছ দিন ধ'রে কোন আহার্য গ্রহণ করেন নি, জল ছাড়া। তা ছাড়া—

তা ছাড়া দ্বিতীয় দিন রাত্রে অসুস্থতা হেতু উঠে দূরে যেতে পারেন নি, নিজের আসনের কিছু দূরেই মলমূত্র ত্যাগ করেছেন।

পুরোহিত বললেন—দেখছেন না, আজ আর আসনে শুয়ে নেই। স'রে দূরে শুয়েছেন! এখন এই সবই বা মুক্ত করে কে—তাই হয়েছে সমস্যা। মেথর ডাকতে হবে।

গোপালদাসী নিজের হাতের ঘটিটি রেখে উঠে গেল দাওয়ার উপর। নীরবে সমস্ত স্থানটি পরিষ্কার করলে। পরিষ্কার করবার সময়েই দেখলে—একটি পাত্রে পরিপূর্ণ পাত্র সাগু রয়েছে, সে সাগু সন্ন্যাসী স্পর্শ করেন নি। বর্ণে গন্ধে সে এক অখাদ্য পানীয়। কালো দুর্গন্ধযুক্ত। গোপালদাসী সে পানীয় ফেলে পাত্রটি পরিষ্কার ক'রে এনে রেখে দিলে। তারপর ওই দেবীর স্থানেই স্নান ক'রে ফি'রে এল। বাড়িতে সযত্নে পরিপাটী ক'রে সাগু এবং বার্লি দুই-ই তৈরি ক'রে দুটি বিভিন্ন পাত্রে নিয়ে আবার এল দেবস্থলে। বললে—বাবা, কিছু খান। আমি খুব যত্নের সঙ্গে তৈরি ক'রে এনেছি। সাগু বার্লি দুই-ই এনেছি। বলুন কি খাবেন?

সে আঁচলের খুঁট খুলে বের করলে একটি পাতিলেবু, দেবস্থলের ভাণ্ডার ঘরে গিয়ে কেটে আনলে। রেখে দিলে সন্ন্যাসীর সম্মুখে।

সন্ন্যাসী চোখ বন্ধ ক'রেই বললেন, রেখে যাও। পরে খাব।

অপরাহ্ণে আবার গোপালদাসী গেল। দেখলে, বার্লির পাত্রটি শূন্য।

পরের দিনও সেই সেবা করলে গোপালদাসী।

তার পরের দিন সন্ন্যাসী উঠে বসলেন, সুস্থ হয়েছেন অনেকটা। বললেন, নমো নারায়ণ। তুমি সাক্ষাৎ নারায়ণী।

গোপালদাসী হেসে ফেললে। অর্থ সে বুঝতে পারে নি।

সন্ন্যাসী বুঝলেন, তিনি ঈষৎ হেসে বললেন,—নারায়ণ মাতৃরূপে আতুর আর্তের সেবা করেন। পূর্ণ মমতা হলেন তিনিই। তোমার মমতা অনেক মা।

গোপালদাসীর চোখে জল এল।

এরপর সন্ন্যাসী চ'লে গেলেন।

সকরি গলিতে (ভাগলপুরের কাছে) সন্ন্যাসীর আশ্রম আছে। সেখানে গেলেন। তারপর আবার এলেন। এবার গোপালদাসী তাঁর কাছে এসে হাজির হ'ল দুধ এবং ফল নিয়ে। সন্ন্যাসী বললেন—মা নারায়ণী, আর তো আমার প্রয়োজন নেই।

গোপালদাসী বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর ফিরল।

সন্ন্যাসী ডাকলেন, শোন মা।

গোপালদাসী ফিরল।

সন্ন্যাসী বললেন, রেখে যাও মা।

গোপালদাসী স্মিত-হাস্যে বিকশিত হয়ে উঠল মুহূর্তে। সযত্নে সেগুলি ঢাকা দিয়ে রেখে বসল কাছে।

এই ভাবেই সন্ন্যাসীর সঙ্গে গোপালদাসীর একটি সুমধুর সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে গেল। গোপালদাসীকে সামনে রেখে গ্রামের অনেকগুলি বঞ্চিত দুঃখিনী তাঁর কাছে গিয়ে উপস্থিত হ'ল। সন্ন্যাসী কয়েকবারই বললেন,—আমার কিছু নেই মা দেবার। কেন এসে তোমরা সময় নষ্ট কর?

মেয়েরা উত্তর দিতে পারলে না। কিন্তু আসাও বন্ধ করলে না। তারা কিছু পেত। নিশ্চয় পেত। দ্বিপ্রহরের মধ্যভাগ উত্তীর্ণ হতে না-হতে গ্রামের মধ্যে নির্দিষ্ট একটি স্থানে তারা এক এক ক'রে সমবেত হ'ত। গোপালদাসী আসত, হাতে তার দুধের পাত্র এবং কিছু ফল। অন্য যাঁরা ফল আনতেন, তাঁরা সে ফল দিতেন গোপালদাসীরই হাতে। নিবেদন করবে সে-ই। দ্বিপ্রহরের গ্রাম্যপথ কলহাস্যে মুখরিত ক'রে তাঁরা দেবস্থল অভিমুখে যাত্রা করতেন।

কোনদিন এ-বাড়ির কোনদিন ও-বাড়ির জানালা খুলে যেত। বিজ্ঞ বিচক্ষণ জনেরা দেখতেন এই মিছিল। তাঁদের ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে উঠতে লাগল। প্রশ্ন উঠল।

কোথায় যায় এরা?

কেন যায়?

কেন এত হাসি?

যায় সন্ন্যাসীর কাছে।

দৃষ্টি বিচিত্র কুটিলতায় সংশয়-সংকুল হয়ে উঠল।

দুই

এই জল্পনার কথা সন্ন্যাসীর কানেও অবশ্যই উঠেছিল। তিনি হেসেছিলেন কি ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন জানি না। তবে তিনি বিচলিত হ'ন নাই, বিচলিত হবার মানুষ তিনি ছিলেন না। নির্ভয়ে সত্যভাষণ ছিল তাঁর আদর্শ, নির্ভয়ে সত্যের পথে চলতেই তিনি সমস্ত জীবন চেষ্টা করেছেন, এটা আমি নির্ভুল ভাবেই জেনেছি।

এই প্রসঙ্গে অনেক দিন পরের একটি ঘটনার কথা বলছি। সে সময় তিনি আমাদের গ্রামের সর্বপ্রধান ধনীর দেবালয়ে অতিথি হিসাবে অবস্থান করছেন। তখন আমি তাঁর গুণমুগ্ধ। আমার সকল ক্ষোভ অভিমান কেটে গিয়েছে। আমি সন্ধ্যার পর তাঁর কাছে যাই, বসি, আলাপ আলোচনা করি। ওদিকে ধনীর নাটমন্দিরে রামায়ণ গান চলছিল তখন। গ্রামের লোকেরা আসে, শোনে। সন্ন্যাসী নাটমন্দির থেকে একটু স'রে একখানি ঘরে আসন পেতেছিলেন। দু চারজন লোক আসর থেকে উঠে আসে মধ্যে মধ্যে। চলে যায়। একদিন আমাদের আলোচনা চলছিল, কি নিয়ে আলোচনা চলছিল আজ তা ঠিক মনে নেই। এমন সময় এসে প্রবেশ করলেন ওই বাড়ীর প্রধান। এই প্রধান ব্যক্তিটি তখন ও অঞ্চলে আধিপত্য-দর্পের প্রতিষ্ঠায় দোর্দণ্ড-প্রতাপ বলে বিদিত। অপ্রিয় সত্যভাষণের আদর্শনিষ্ঠায় কণ্ঠস্বর রূঢ়, দৃষ্টি উগ্র, হাসি তীক্ষ্ণ, ব্যঙ্গের বক্রতায় অর্দ্ধচন্দ্রবাণের ভঙ্গিতে বক্র। লোকে বলত দেবতাকেও তিনি খাতির ক'রে কথা বলেন না। তিনি এসে আমাদের কাছেই আসন গ্রহণ করলেন এবং শুনতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পরেই আমাদের আলোচনায় যোগ দিতে চেষ্টা করলেন—মধ্যে মধ্যে দুটি চারটি কথা বলতে সুরু করলেন। সে কথাগুলি যেমন অসার তেমনি অবান্তর; অথচ কণ্ঠস্বরে ও ভঙ্গিমায় ঠিক উদ্ধত না

হলেও কর্তৃত্বব্যঞ্জক। ক্রমশ আবহাওয়া খারাপ হয়ে উঠছিল। তিনি আমার গুরুজন, প্রতিবাদ আমার পক্ষে শোভনও ছিল না, মঙ্গলজনকও ছিল না। ভাবছিলাম উঠে যাই। এমন সময় বিচিত্র সংঘটন হল। ধনীটি কী যেন অকাট্যরূপে প্রমাণিত করবার জন্য গীতার শ্লোক আবৃত্তি করলেন—

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য ইত্যাদি।

তাঁর আবৃত্তি শেষ হতেই সন্ন্যাসী স্বাভাবিক মৃদু কণ্ঠে বললেন, জদা নয় বাবা, ওটা যদা; যদার প্রথম অক্ষরটা বর্গীয় জ নয়, ওটা অন্তস্থ য। দেবভাষা উচ্চারণ করতে হ'লে জিহ্বাকে সংযত করতে হয়। অন্তত আমার মত লোক যারা সংস্কৃত ভাষাকে দেবভাষা মনে করি—তাদের কাছে হয়।

আশ্চর্য ধীরতা এবং স্বাভাবিকতার সঙ্গে কথাগুলি বললেন, যাতে আমাদের একবিন্দু হাস্যোদ্রেক হল না। ধনীটিও ক্রুদ্ধ হবার সুযোগ পেলেন না। শুধু বিহ্বলের মত জিজ্ঞাসা করলেন 'জদা-জদা হি' নয়?

আমি এবার তাঁকে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করলাম জ ও য এর প্রভেদ।

কয়েক মিনিট স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন ধনী ব্যক্তিটি। সন্ন্যাসী যেমন আমার সঙ্গে আলোচনা করছিলেন তেমনি স্বাভাবিক ভাবেই আলোচনা ক'রে চললেন। রূঢ় কিছু, অপ্রিয় কিছু সংঘটনের কোন প্রকাশই আলোচনার স্বাভাবিকতাকে ক্ষুণ্ণ করতে পারলে না। কয়েক মিনিট পরে ধনী ব্যক্তিটি উঠে চলে গেলেন। এতেও সন্ন্যাসী ভ্রূক্ষেপ করলেন না। এই ঘটনাটির উল্লেখ আছে আমার দুই পুরুষ নাটকের মধ্যে।

এমনি মানুষ সে সন্ন্যাসী। জীবনে সাধনায় এমনি ব্যক্তিত্ব তিনি অর্জন করেছিলেন এবং সে ব্যক্তিত্ব এমনি সুদৃঢ় সত্যবিশ্বাসের উপর

প্রতিষ্ঠিত ছিল যে, তাঁকে বিচলিত করা, চঞ্চল করা সহজ ছিল না। তিনি বিচলিত হন নি। এ মানুষের তুলনা গিরিচূড়ার সঙ্গে। বাইরের ঝড় ঝঞ্ঝা তাকে নড়াতে পারে না, কাঁপাতে পারে না; স্থির অবিচলিত গিরিচূড়া মগ্ন থাকে আপন তপস্যায়। সে নড়ে, সে কাঁপে, সে ভাঙে যখন গিরিগর্ভের তাপ পরিণত হয় বহ্নিতে; যখন তার নিজের বুকের ভিতরে আগুন লাগে তখন। তার আগে নয়। সে তাপমাত্রাকে বাড়িয়ে বহ্নিতে পরিণত করে অন্তরের দুর্বলতা, মনের অপরাধবোধ।

এ দিকে বাইরে গ্রামের মধ্যে মানুষের রসনার মুখরতা কুটীলতর এবং প্রবলতর হয়ে উঠল। সাধারণ মানুষের স্বভাবই এই। প্রতিবাদ না হলে চীৎকার তারা বাড়িয়েই চলে, বাড়িয়েই চলে। তারা শোনা কথার পুনরাবৃত্তি করে। এ কথা যারা তাদের শোনায়, তারা সমাজের এক বিচিত্র শ্রেণীর মানুষ। ধনসম্পদ অথবা বড় চাকরীর অধিকারে সমাজে গণ্যমান্য সেজে বেড়ান, অন্তরের মধ্যে গাঢ় অন্ধকার, তারই ছায়ায় তাদের দৃষ্টি বিকৃত। দুনিয়াকে সেই বিকৃত দৃষ্টিতে দেখে ব্যাখ্যা করে ফতোয়া জারী করে তারা।

ক্রমে গোপাল দাসীও একটু বিব্রত বোধ করতে আরম্ভ করলে।

এ ঘটনার কথা তার কানে উঠতে খুব দেরী হয় নি! শুনেছিল সে অনেকদিন আগেই, কিন্তু গ্রাহ্য করে নি। অন্তরের তৃষ্ণা তাকে ছুটিয়ে নিয়ে চলেছিল, এই ঘটনা শুনে থামবার বা থমকে দাঁড়াবার মত শক্তিই তার ছিল না। এই বৃদ্ধ সন্ন্যাসীটির কাছে সে অন্তর-তৃষ্ণা পরিতৃপ্তির শান্তিসুধার অভ্যাস পেয়েছে। অসহায় জীবনে এক পরম সহায়ের অভয়ের ইঙ্গিত পেয়েছে। গোপাল দাসীর সঙ্গে আর যে সব মহিলারা সন্ন্যাসীর কাছে যেতেন তাঁদের অধিকাংশই নিবৃত্ত হয়েছেন। কিন্তু দু-একজন নিবৃত্ত হন নি। এঁদের মধ্যে ছিলেন

গ্রামের ওই সর্বশ্রেষ্ঠ ধনীটির পরমাত্মীয়া কনিষ্ঠা ভ্রাতৃবধূ। এই মহিলাটির মনেও আছে এক পরম তৃষ্ণা। ধনসম্পদের অভাব কোনদিন ছিল না, আজও নাই, সাজানো সংসার তখন, গৌরবান্বিত স্বামীর গৌরব, গুণগৌরব, কর্মগৌরব, বহু প্রশংসিত সন্তান গৌরব, সর্বশ্রেষ্ঠ ধনী-গৃহিণী হিসাবে সমাজে প্রতিষ্ঠা-গৌরব কিছুরই অভাব তাঁর কোনদিন ছিল না। তবু তিনি কোন এক অজানার সন্ধানে কোন ব্যাকুল তৃষ্ণায় সমগ্র ভারতবর্ষ পর্যটন করেছেন; একবার নয় বারবার। প্রথম বেরিয়েছিলেন স্বামীকে সঙ্গী ক'রে। ক্রমে স্বামী ক্লান্ত হলেন; তারপর সঙ্গী করলেন সন্তানকে। সন্তানও ক্লান্ত হল বা অসম্মত হ'ল,—তাকে তখন টেনেছে তার কর্মজীবন, তখন তিনি একাই ঘুরেছেন। বদ্রীনাথ, অমরনাথ, মানস সরোবর, দ্বারকা, কামাখ্যা, কন্যাকুমারী—আজও তিনি ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

বিব্রত বোধ ক'রে গোপালদাসী এঁরই সঙ্গে পরামর্শ করে একদা সন্ন্যাসীর কাছে সসংকোচেই সব নিবেদন করলে।

সন্ন্যাসী বললেন, মা, যে প্রদীপ শিখা আলো দেয় সেই শিখার মাথায় কালি ওঠে। করবে কি মা? দৃষ্টিরও ধর্ম তাই। সত্যকে আবিষ্কার করতেই তার সৃষ্টি, কিন্তু মিথ্যাকে দেখবার জন্যই তার ব্যাকুলতা।

গোপাল দাসী প্রশ্ন করলে, আমরা কি করব?

—যা তোমাদের ইচ্ছা। ভয় হ'লে এস না। ভয় না-পাও, এস।

গোপালদাসী বললে—আমাদের জন্যে ভয় তো পাই নে বাবা। ভয় পাই—। কথাটা তার মুখ থেকে বের হ'ল না।

—আমার জন্যে?

—হ্যাঁ বাবা। এ আশ্রমের সেবায়েত হ'ল জমিদার। এ গাঁয়ে সবাই জমিদার। বিশেষ ক'রে যারা এই সব রেশী রটাচ্ছে তারাও

জমিদার। তা ছাড়া গ্রাম থেকে মাঠের পথ ভেঙ্গে এতটা আমরা আসি। পথে লোকে টিট্‌কারী দেয়, হাসে। আবার বলে, আপনাকে অপমান করবে।

—আমার জন্যে ভেবো না মা।

—না, বাবা। আমার মন মানছে না।

তার চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ল।

দুরন্ত প্রলয়-বর্ষণে পাথর গলে না। কিন্তু চোখের জল বড় বিচিত্র বস্তু; পাথরের মত মানুষ দু ফোঁটা চোখের জলে গলে যায়। জহ্নুমুণি নিঃশেষে পান করেছিলেন ভাগীরথীর ধারাকে। কিন্তু ভগীরথের দু ফোঁটা চোখের জল তাঁকে এমন বিচলিত ক'রেছিল যে, নিঃশেষিত ভাগীরথীর ধারা দ্বিগুণিত প্রবাহে জহ্নুমুনির বিদীর্ণ জঙ্ঘাপথে বেরিয়ে এসেছিল।

সন্ন্যাসী সস্নেহে বললেন—আমাকে কি করতে হবে বল? এখান থেকে চলে যাব?

—না। আপনি আমাদের গ্রামের মধ্যে চলুন।

—গ্রামের মধ্যে কোথায়?

—এঁদের ঠাকুর বাড়ী।

গোপালদাসীর ইঙ্গিত তিনি বুঝলেন। ওই ধনী জমিদারের ঠাকুরবাড়ীতে যেতে বলছে। সেখানে প্রহরার অভাব হবে না। অন্য কোন লোক সেখানে প্রবেশ করতে সাহস করবে না। অন্তত এই উদ্দেশ্য।

সন্ন্যাসী বললেন—না। তোমার যদি নিজের কোন আশ্রয় থাকে সেখানে যাব আমি। কিন্তু ওখানে আমি যাব না। রক্ষীর রক্ষণাধীনে থাকা আর বন্দীশালায় বন্দী হ'য়ে থাকায় তো প্রভেদ নেই মা।

গোপালদাসী বললে—তাই চলুন। আমাদের ঠাকুর বাড়ীতে।

আমাদের ঠাকুর বাড়ী অর্থে সাজার চণ্ডীমণ্ডপ। তাতে গোপালদাসীর অধিকার অত্যন্ত অল্প; বিষয়ীর হিসাবে পয়সাখানেক। এই ঠাকুর বাড়ীটি আমাদেরই বাড়ীর সংলগ্ন এবং আমাদেরই অংশ সেখানে আট আনা।

সন্ন্যাসী এবার আর আপত্তি করলেন না, এসে উঠলেন আমাদেরই ওই সাজার ঠাকুর বাড়ীতে; দুর্গা ঘরের মধ্যে নিজের হোমকুণ্ড জেলে আসন পাতলেন।

গ্রামের লোক স্তম্ভিত হল। এটা তাদের চোখে স্পর্দ্ধা বলে মনে হ'ল। এতবড় সন্দেহকে উপেক্ষা ক'রে ওই অসহায়া মেয়েটা সন্ন্যাসীকে নিয়ে গেল নিকটতম সান্নিধ্যে?

* * *

আমি নিজে চিরকালই উঠি খুব প্রত্যূষে। অরুণোদয়ে, প্রায় উষাকাল বললেও অত্যুক্তি হয় না। "ডাকে পাখী না ছাড়ে বাসা—খনা বলেন—সেই হ'ল উষা।" এই সময়ে উঠে আমি যেতাম প্রাতর্ভ্রমণে।

ঠাকুরবাড়ীতে সন্ন্যাসীর আগমনের কথা আমি জানতাম না। প্রথম দিন ভোরেই তাঁর সঙ্গে দেখা হ'ল। দেখা হ'ল না, তাঁকে দেখলাম। দেখলাম ঘরের মধ্যে আসনের উপর সন্ন্যাসী শীর্ষাসনে যোগে বসেছেন।

পরের দিন—উঠতে আমার একটু দেরী হয়েছিল। সে দিন দেখলাম যোগাসনের ক্রিয়া শেষ ক'রে ধ্যানে বসে আছেন।

তার পর দিন দেখলাম—সন্ত স্নান ক'রে ফিরছেন। আমার সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল। তিনি থমকে দাঁড়ালেন।

অগত্যা আমি গৃহী হিসাবে প্রথমেই তাঁর অন্তরস্থ দেবতাকে নমস্কার করলাম—নমো নারায়ণায়।

তিনিও বললেন—নমো নারায়ণায়।

সঙ্গে সঙ্গেই আমি পা-বাড়ালাম। তিনিও প্রবেশ ক'লেন দুর্গামন্দিরে।

এরপর আমি প্রাতর্ভ্রমণের দিক পরিবর্তন করলাম।

কয়েকদিন পর একদিন,—তখন বেলা প্রায় এগারটা, আমি আমার অভ্যাসমত উদ্দেশ্যহীন প্রান্তর ভ্রমণ শেষ ক'রে বাড়ী ফিরছি; গ্রামে ঢুকেই দেখলাম, গ্রামের এক প্রতাপশালী গৃহস্থ জমিদারের কাছারী বাড়ীর সামনে পথের উপর একটি জটলা। এই প্রতাপশালী গৃহস্থটি গোপালদাসীর পিতৃকুলের জ্ঞাতি; শুধু জ্ঞাতিই নয় অভিভাবক বল্‌তেও এঁরাই। গোপালদাসীর পৈত্রিক সম্পত্তি সামান্যই, যেটুকু আছে তাও এঁদেরই হাতে। গৃহস্থ কর্তা ব্যক্তিদের জন দুয়েক দাঁড়িয়ে আছেন তাঁদের দাওয়ার উপর। আর পথের উপর দাঁড়িয়ে আছেন গ্রামেরই জন চারেক (চারজনকে মনে পড়ছে আমার) প্রবলপ্রতাপ ব্যক্তি।

প্রতাপ বস্তুটাই ব্যক্তিগত। প্রতিষ্ঠা নির্ভর করে কর্মের উপর, অর্থনৈতিক সাফল্যের উপর, কিন্তু প্রতাপ নির্ভর করে ব্যক্তিগত দুর্দান্তপনার উপর। দেহের শক্তি, গলার শক্তি, অপ্রিয় ভাষা এবং কঠোরতা ছাড়া প্রতাপশালী হওয়া যায় না। অর্থ থাকলে দেহের শক্তি না থাকলেও চলে, অর্থবলে নিযুক্ত করা পাইক চাপরাশী দিয়ে ও-কাজটি চলে যায়। এর উপরে যদি গুণপনা বা পাণ্ডিত্যের খ্যাতি যুক্ত হয় তবে তো আর কথাই থাকে না। বোঝার উপরে শাকের আঁটি এমন ক্ষেত্রে লোহার ডাণ্ডার বাণ্ডিলের মত গুরুভার হয়ে ওঠে। ধনবানের হাতে গিল্টীর আংটিতে ঝুটো পাথরের মত কৃত্রিম মূল্যে মূল্যবান হয়। লোকে তখন লক্ষ্মী সরস্বতীর একত্র মিলন দেখে কল্পনানেত্রে।

সেদিন রাস্তার উপর যে চারজন প্রতাপশালী ব্যক্তি জটলা পরিচালনা করছিলেন তাঁদের মধ্যে তিনজন এমনি ধরনের প্রতাপশালী ছিলেন। দুজন ছিলেন সরকারী কর্মচারী, কলকাতায় থাকতেন চাকরী উপলক্ষে, তৃতীয় জনই মুখপাত্র; এঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি ছিল এবং ব্যবসায়ে কৃতীপুরুষ, কলকাতায় আপিস, সুতরাং গুণে ও জ্ঞানে ষোল কলায় পরিপূর্ণ তাতে সন্দেহ কোথায়? চতুর্থ জন ছিলেন গ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা—নেশায় আসক্ত, নিজের বোধ ও বুদ্ধিমত ধর্মে অনুরাগী, সরল সোজা মানুষ। আমার চোখে ইনিই ছিলেন সত্যকারের প্রতাপশালী। অপার সাহস, দুর্দান্ত ক্রোধ, বিপুল দৈহিক শক্তি সবই তাঁর ছিল, তাঁর দৃষ্টিতে এবং মতে যা অন্যায় বলে মনে হয়েছে তার প্রতিবাদ, সক্রিয় প্রতিবাদ করতে কখনও দ্বিধা করেন নি। বোধশক্তি দুর্বল, যে যা বুঝিয়েছে তাঁকে তাই তিনি বুঝেছেন, বিশ্বাস ক'রেছেন, নইলে লোকটি সত্যই ভালো লোক! আমার রচনার মধ্যে বহুস্থানে তিনি আবির্ভূত হয়েছেন শূলপানি নামে।

যাই হোক, সেই দিনের কথাই বলি। আমি তাঁদের পাশ কাটিয়ে চলে যাব এমন সময় এক ব্যক্তি বলে উঠলেন, এই যে! এই লোকটি!

অগত্যা দাঁড়াতে হ'ল। এবং প্রশ্নও করতে হ'ল, কি ব্যাপার?

—Sir, তুমি আমাদের মত বারমাস বাইরে থাক না। এখানে তুমি প্রায়ই রয়েছ। গ্রামের কোথায় কি অন্যায় হচ্ছে সে দিকে দৃষ্টি থাকা উচিৎ। প্রতিবিধান করা উচিৎ।

তখনও আমি সত্যই বুঝতে পারি নি হাওয়া কোন দিকে বইছে। কারণ সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সকল ব্যাপারেই

এঁরা ছিলেন গীতার সেই "যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানি" শ্লোকের দুষ্কৃতি-বিনাশ-কারী পুরুষটির মত। এঁরা গ্রামে এলেই সমাজ ইউনিয়নবোর্ড নিয়ে অন্ততঃ খান কয়েক বেনামী দরখাস্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের দরবারে গিয়ে হাজির হত। দুটো একটা ব্যক্তিগত দেনা পাওনার সমস্যা জটীলতর হয়ে উঠত। কাজেই কোন্ অন্যায়, কোন্ পাপের জন্য ধর্মক্ষেত্রে এমন রথী সন্নিবেশ হ'তে চলেছে সে কেমন ক'রে বুঝব ?

প্রশ্ন করলাম, অন্যায়! পাপ? সে তো সমাজে রয়েইছে। কোন—

বাক্য শেষ করতে হ'ল না আমাকে। মধ্যপথেই কথা কেড়ে নিয়ে একজন বলে উঠলেন—Are you blind? Are you deaf?

অন্য একজন বললেন—তোমার বাড়ীর দোরে, তোমাদের পৈত্রিক দেবালয়ে পাপের লীলা চলছে, তুমি জান না?

—একটা সন্ন্যাসীকে নিয়ে যুবতী মেয়ে একেবারে গ্রামের ভিতরে কেলেঙ্কারী কাণ্ড করছে তুমি শোন নি? তোমার বাড়ির দোরে, তুমি দেখ নি?

ইঙ্গিতটি বুঝবামাত্র আমার অন্তর একদিকে ঘৃণায় সঙ্কুচিত হয়ে উঠল, মনে পড়ল অশীতিপর যোগাভ্যাসী সন্ন্যাসীর মূর্তি, তাঁর ধ্যানমগ্ন মূর্তি, যে কয়েকবার তাঁকে আমি দেখেছি সব কয়েকবারের ছবিই আমার মনে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে অন্তর প্রতিবাদ করে উঠল। সে প্রতিবাদ আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল; আমি বললাম, এসব কথার উত্তর দেবার আগে আমি প্রশ্ন করব, তোমরা ক কেউ এ সন্ন্যাসীকে দেখেছ?

—দেখবার কি আছে এর মধ্যে?

—আছে। যে পাপের উল্লেখ তোমরা করছ তার একটা বয়স আছে। এই সন্ন্যাসীকে আমি দেখেছি। তাঁর মুখ দেখে, তাঁর আচরণ দেখে আমার যে ধারণা হয়েছে সে ধারণার কথা থাক, তোমাদের কাছে বলতে গিয়ে উপহাসাস্পদ হব না। কিন্তু তাঁর বয়সের কথা অবশ্যই বলব। তাঁর বয়স আশীর ঊর্ধ্বে, তাঁর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ অবাস্তব অসম্ভব বলেই আমি মনে করি।

তাঁরা একেবারে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন।

আমি বাধা দিলাম। বললাম, আরও একটা প্রশ্ন আছে। সেটা হ'ল—অধিকারের প্রশ্ন। হিন্দু সমাজে গুরু কার নাই? সকলেরই আছে। কার গুরু বৎসরে দু-একবার শিষ্যবাড়ী না আসেন? সকলের বাড়ীতেই গুরুর পায়ের ধুলো অবশ্যই পড়ে। এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে গুরু পুরুষরূপেই আসেন। গুরুপত্নী আসেন না। গুরু যখন আসেন তখন কার পত্নী গুরু-সেবা না করেন? এবং এই সেবার কালে ক'জন অভিভাবক উপস্থিত থাকেন পাহারা দিতে? আমি অধিকারের কথাই বলছি—কোন ক্ষেত্রেই কলুষ আরোপণের চেষ্টা করছি না। জানতে চাচ্ছি—গোপালদাসী এই সন্ন্যাসীকে গুরুপদে বরণ ক'রে ঘরের কাছে চণ্ডীমণ্ডপে তাঁকে স্থান দিয়ে কোন অধিকার-বহির্ভূত কাজ করেছে? সকলের যে অধিকার আছে সমাজে—সে অধিকার থেকে সে বঞ্চিত হবে কোন অপরাধে? সে অভিভাবকহীনা, দুর্বল, দরিদ্র, এইটেই কি তার অপরাধ? যাঁর অভিভাবক আছে—তাঁর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ কে করত শুনি?

সমস্ত জটলার কোলাহল কয়েক মুহূর্তের জন্ত স্তব্ধ হয়ে গেল।

আমি সঙ্গে সঙ্গে পা বাড়ালাম। কয়েক পা এসেছি এমন সময় পিছনে যেন বিস্ফোরণ হয়ে গেল।

শূলপানি চীৎকার করে উঠল—অপরাধ অধিকার বুঝিয়ে দোব আজ! আজই। হাঁ হামারা নাম শূলপানি।

একজন বললেন—ঠিক বলেছ! আজই বেটা ভণ্ড সন্ন্যাসীকে রীতিমত শিক্ষা দিয়ে—ঘাড়ে ধরে—গ্রাম থেকে বের করে দাও। ঘা কতক দেবে—আচ্ছা ঘা-কতক।

আমি আবার দাঁড়ালাম। বললাম—তা হ'লে সর্বাগ্রে আমার সঙ্গে দেখা হবে। আমি বাধা দেব।

বলেই আমি চলে এলাম।

পিছনে শূলপানি চীৎকার করতে লাগল। আমাকে শোনাবার জন্যই চীৎকার। চীৎকার ক'রে নানা কুৎসিত ইঙ্গিত এবং সঙ্গে সঙ্গে ভয় প্রদর্শন।

তিন

শূলপানির ক্রোধকে আমাদের ওখানকার লোকে ভয় করে। শূলপানির রোষ-চীৎকার শূন্যগর্ভ কুম্ভনাদ নয়। চিরকালের দুর্দান্ত শূলপানি। সাহসও যত, ক্রোধও তত। ক্রুদ্ধ হলে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ে শূলপানি। ভূত প্রেত সাপ বাঘ কাউকে সে ভয় করে না; সত্য সত্যই করে না। সে গোখরো সাপ ধরত খেলাচ্ছলে। দাঁত ভেঙে বাচ্চা গোখরো পকেটে কাগজে মুড়ে রেখে দিত। রহস্য করে হঠাৎ লোকের গায়ে ছুড়ে দিয়ে হি-হি ক'রে হাসত। প্রথম যৌবনে সামান্য অজুহাতে লোকজনকে মারধর করাই ছিল নিত্য কর্ম। সেই সময় একদিন নিজেদের বাড়ীর খিড়কীতে নেমে সামনে পেয়েছিল একটা ঢোঁড়া সাপ। সাপটাকে সঙ্গে সঙ্গেই পাকড়াও করে বাড়ী এনে বউদিদিদের সামনে সেটার খেলা দেখাতে গিয়ে কৌতুক ভরে এক বউদিদির গায়ে সেটা ফেলে দিয়েছিল। ঢোঁড়া সাপ বিষহীন কিন্তু তবুও সাপ। বউদিদি ভয়ে চীৎকার ক'রে উঠেছিলেন স্বাভাবিক ভাবেই। সেই চীৎকারে শূলপানির দাদা ছুটে এসে ঘটনা দেখে দুরন্ত ক্রোধে শূলপানিকে নিষ্ঠুর প্রহার শুরু করে দিয়েছিলেন। শূলপানির দাদা শূলপানি অপেক্ষাও বলিষ্ঠ ব্যক্তি তখন। শূলপানি প্রহারের প্রতিশোধ দৈহিক শক্তিবলে নিতে অক্ষম হয়ে বের করেছিল ছুরি এবং সেটা দাদার বুকে বসিয়ে দিয়েই বেরিয়ে পালিয়েছিল। তখন বর্ষার সময়—আমাদের গ্রামপ্রান্তের কোপাই নদী তখন দুকূল পাথার। সেই নদী সাঁতরে পার হয়ে কিছুদিনের জন্য সে নিরুদ্দেশ হয়েছিল। ভাগ্য কার বেশী ভাল জানি না—ছুরিটা ছিল কলমকাটা ছুরি, ফলাটা খুব বড়

ছিল না, তাই দাদাও বেঁচেছিল—শূলপানিও ফাঁসির হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছিল।

যে সময়ের কথা—সে সময়ে শূলপানি বোধ হয় তার জীবনের মধ্যে সবচেয়ে বেশী উদ্ধত এবং উগ্র হয়ে উঠেছে। কারণ তখন তার ছোট ভাই হয়েছে আই-বি ইনস্পেক্টর এবং সেই সময়টা ১৯৩০ সালের পরবর্তী কাল, তখন বাংলাদেশ আই বি পুলিশের দ্বারাই শাসিত। সুতরাং শূলপানির ক্রোধ তখন বৈশাখের কালবৈশাখী মেঘের বজ্র বিদ্যুতের মত অবাধ অধিকারে স্ফুরিত হয়। তার উপর সেদিন তার পিছনে ছিল—উত্তাপ ও ঝঞ্ঝার সহযোগিতার মত গ্রামের দুই বিশিষ্ট-জনের পৃষ্ঠপোষকতা।

আমার সম্বল ছিল আমার আদর্শবাদের অভয়। এ অভয় বিচিত্র, অমোঘ, অপরাজেয়। রবীন্দ্রনাথের নৈবেদ্যে যে অভয় কামনা ধ্বনিত হয়েছে এ অভয় সেই অভয়, "তোমার ন্যায়ের দণ্ড প্রত্যেকের করে অর্পণ করেছ নিজে, প্রত্যেকের করে দিয়েছ শাসনভার, রাজ অধিরাজ।" এ অভয় সেই অভয়। সেই অভয় আমাকে মুহূর্তে করে তুলেছিল অচঞ্চল, স্থির। আমি দৃঢ় পদক্ষেপেই বাড়ী ফিরে এলাম। বেলা তখন বোধ হয় বারোটা। স্পষ্ট মনে রয়েছে আজও মনে আমার কোন দুশ্চিন্তা ছিল না। মন আমার তখন সংকল্পে স্থির। আমি স্থির করেছি, আমাদের বাড়ীর যে দরজায় ঠাকুরবাড়ী সেই দরজার মুখে আমি বসে থাকব। এখানে বসলে যেই দিক দিয়ে যেই আসুক আমাদের ঠাকুরবাড়ীতে—আমার দৃষ্টির অগোচর থাকবে না। যে মুহূর্তে যে কেউ আসবে আমি তার সামনে পথ রোধ ক'রে দাঁড়াব। আমার চেতনা এবং শক্তি যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ কেউ ওই বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর গায়ে হাত দিতে পারবে না। এবং এও জানি আমার রক্তপাত হ'লে তাতেই আক্রমণকারীর আক্রমণপিপাসা মিটে

যাবে। তাকে ফিরে যেতে হবে। নিঃশেষিত-বীর্য নিঃশেষিত-ক্রোধ হয়ে ফিরতে হবে।

এ কথা আমার জীবনদেবতার সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অকুণ্ঠিত ভাবেই বলছি যে, সেদিন সেই সংকল্পে স্থির অথবা প্রতিষ্ঠিত হতে আমাকে এক বিন্দু চেষ্টা করতে হয় নি। চিন্তা ক'রে দেখতে হয় নি—আমার কর্তব্য কি? চোখের উপর আঘাত উদ্যত হলে চোখের পাতা যেমন আপনি চোখকে ঢেকে নেমে আসে তেমনি ভাবেই ঐ চোখের পাতার মতই আমি এ আঘাতকে প্রতিহত করবার জন্য সন্ন্যাসীকে আড়াল ক'রে দাঁড়াবার সংকল্পে স্থির হ'য়েছিলাম। কোন প্রশ্ন ছিল না, কোন প্রশংসার লোভ ছিল না, কোন মহৎ কর্ম সাধনের গৌরববোধ ছিল না। স্বতোৎসারিত একটি জীবন-বেগ।

বোধ করি এই কারণেই আমি তন্ময় হয়ে গেলাম এই কর্তব্য পালনের চিন্তায়। বাড়ীতে ছোটখাটো কয়েকটা কাজ ক'রে বেড়াচ্ছি যন্ত্রচালিতের মত; কিন্তু আমার সমগ্র অন্তর-কল্পনা ওই চিন্তায় মগ্ন হয়ে আছে। ঝড়ের আঘাত সহ্য করবার জন্য স্তব্ধ পৃথিবীর মত আমার চিত্তলোকের অবস্থা। বস্তু জগতের যেটুকু আমার চোখের সম্মুখে সেটুকু অর্থহীন—তার সঙ্গে কোন সংযোগ আমার নেই, আমার মনশ্চক্ষুর সম্মুখে আছেন ওই সন্ন্যাসী; সেই তেমনি হোমবহ্নির দিকে নিবদ্ধ-দৃষ্টি হয়ে স্থির বৃদ্ধ বসে আছেন।

আমার মা আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন—আমার এই স্তব্ধ তন্ময়তা তার চোখ এড়ায় নি। আমি অসংলগ্ন ভাবেই উত্তর দিয়েছিলাম।

স্ত্রীও লক্ষ্য করেছিলেন; তিনি প্রশ্ন করেন নি—ভেবেছিলেন হয় বুলুকে ভাবছি, নয় লেখার ভাবনায় মগ্ন রয়েছি।

আমার নিজের কোন প্রশ্নই ছিল না।

পরে বুঝেছি—আমার নিজের বিশ্লেষণে বিশ্লেষণ ক'রে দেখেছি, এ সেই তন্ময়তা, সেই ধ্যানযোগ যে যোগের আকর্ষণে বিচিত্র আপনাকে প্রকাশ করেন মানুষের সম্মুখে।

থাক্, বিশ্লেষণের কথা থাক্। ঘটনার কথা বলি। তারই মধ্য দিয়েই সে আসে এবং সেদিন সে এসেছিল। যেমন একদিনরাত্রে এসে আমাকে দেখা দিয়ে মৃত্যু যবনিকার সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে অদৃশ্য হয়েছিল।

হঠাৎ এক সময় কার ডাকে মুখ তুলে দেখলাম—গোপালদাসী আমার সামনে দাঁড়িয়ে। সে আমাদের বাড়ীতে এসে আমার মাকে সঙ্গে নিয়ে আমার কাছে এসেছে।

গোপাল দাসী না হেসে কথা বলতে পারত না, জানত না।

সেদিন দেখলাম গোপাল দাসী বিষণ্ণ; শঙ্কাকাতর তার দৃষ্টি, ঠোঁট দুটি কাঁপছে।

কোন রকমে আত্মসম্বরণ ক'রে সে বললে, আমি এসেছি তোমার কাছে।

তখন আমি আমার চিন্তায় মগ্ন। সেই মগ্নতার মধ্য থেকেই উত্তর দিলাম, উত্তরে তাকে প্রশ্নই করলাম—কেন বল তো?

—কি হবে? চোখে তার জল টলমল ক'রে উঠল।

—কিসের?

গোপালদাসী বিস্মিত হয়ে বললে—তবে যে শুনলাম তুমি ছিলে সেখানে। তোমার সঙ্গেই কথা হয়েছে। তুমি তাদের বলে এসেছ—তারা যদি বাবাকে অপমান করতে আসে, কি মারধর করতে আসে তবে তুমি বাধা দেবে।

—ওঃ। আমার এতক্ষণে বোধগম্য হল। পৃথিবীতে ফিরে এলাম। হেসে বললাম, হ্যাঁ, বলেছি। আর বাধা আমি দেব। তুমি ভয় করো না। তবে সাবধানে থেকো।

মুহূর্তে আর একটা কথা মনে হল। মনে হ'ল—গোপালদাসী যখন বিদ্রোহ করেছে তখন বিদ্রোহের চরম ক'রে দিক। নিয়েই যখন এসেছে গ্রামের মধ্যে তখন বাইরের দেবালয়ে কেন? গুরু বলে শরণ নিয়েছে; বাবা বলে স্নেহের প্রত্যাশায়, অভয়ের আশায় সেবা করছে, তখন ঘরেই বা নিয়ে যাবে না কেন? আর বৃদ্ধ সন্ন্যাসী যখন এতটাই স্বীকার করেছেন, বন্ধনকে স্বেচ্ছায় বরণ করেছেন, তখন তিনিই বা যাবেন না কেন? গৃহীর গৃহ? হ'লই বা। তিনিও তো আশ্রমে চারখানা দেওয়ালের মধ্যে আচ্ছাদনের তলেই থাকেন! তাঁর পদার্পণে গৃহীর গৃহকেই তিনি আশ্রম করে তুলুন না। তাঁকে যদি অপমানিত লাঞ্ছিত হ'তে হয় তবে সেইখানে দাঁড়িয়েই তিনি তা মাথা পেতে গ্রহণ করুন। পরম দেবতার যে শাসনদণ্ডের অধিকার আমি পেয়েছি, সেই দণ্ড হাতে আমি গোপাল দাসীর দরজাতেই গিয়ে দাঁড়াব।

বললাম সেই কথা গোপালদাসীকে। বললাম, আমি বলি—তোমার গুরুকে তুমি তোমার বাড়ীতে নিয়ে যাও।

গোপালদাসী প্রদীপের মত জ্বলে উঠল, বললে—যাব? নিয়ে যাব?

—কেন যাবে না? তোমার গুরু। কার গুরু ঘরে না আসেন?

—তুমি একবার আসবে? বাবাকে বলবে?

—না। তোমার গুরু, তুমি বলবে। আমি কেন বলব?

—তোমার নাম কিন্তু করব আমি।

না। তা' ক'র না।

গোপালদাসী কানে কথাটা না-তুলেই চলে গেল। স্নান ক'রে খেতে বসেছি এমন সময় খবর পেলাম—সন্ন্যাসীকে গোপালদাসী নিজের বাড়ীতে নিয়ে গিয়েছে।

ঘণ্টাখানেক পর—গোপালদাসী আবার এল। বললে—আবার এলাম।

—কেন?

—বড় বাড়ীর ছোট গিন্নী কথাটা বলে পাঠিয়েছিলেন—বাবুদের কাছে। ওঁরা বলেছেন—দুজন চাপরাশী পাঠিয়ে দেবেন—রাত্রে পাহারা দেবার জন্যে।

—সে কথা শুনে আমি কি করব?

গোপালদাসী বললে—কিন্তু বাবা বলছেন—চাপরাশী পাহারার মধ্যে তিনি থাকবেন না। তা' হ'লে আজই চলে যাবেন। তা' তুমি যদি একবার এস, বাবাকে একটু বুঝিয়ে বল তো ভাল হয়।

বললাম—সে বলতে আমি যাব না গোপালদাসী। তোমার গুরুকে রক্ষা করতে কোন লোকের দরকার নাই। চাপরাশীরও নাই—আমারও নাই। এ মানুষকে রক্ষা করবার জন্যে মানুষের দরকার হয় না। ওঁর অপমান করতে, গায়ে হাত দিতে কারও শক্তি নাই। মিথ্যে গুরুর কাছে খেলো হয়ো না। বাড়ী যাও।

গোপালদাসী কিছুক্ষণ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থেকে চলে গেল। বুঝলাম—বুঝেও ওর মন বুঝতে চাইছে না। সে দুর্বল, সে অসহায়, তার উপর এমন উচ্ছ্বসিত শ্রদ্ধা;—সমস্ত মিলে তাকে এমন অবুঝ ক'রে তুলেছে যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বরের আশ্বাসেও আশ্বস্ত হবে না, তাঁর বুঝিয়ে বলাতেও ওর অবুঝপনা ঘুচবে না।

মনে রয়েছে—শুক্লপক্ষ চলছিল তখন।

ঠিক কি মাস সেটা মনে নাই তবে আকাশ ছিল নির্মেঘ এবং বড় নির্মল। সন্ধ্যা হ'তে না-হতেই জ্যোৎস্না ফুটে উঠত ঝরা-শিউলিতে-আচ্ছন্ন নিকানো অঙ্গনের মত। সন্ধ্যা হতে না-হতে মাটির উপর নিজের ছায়া পড়ত। ক্রমশ সে ছায়া গাঢ় হত। আকাশের নীল ঝলমল করত। সেদিন বিকেলে বাইরে যাই নি। আমার হারানো-মেয়ের সন্ধানে নিত্য শ্মশানে যাওয়া সেই দিন বোধ করি প্রথম বন্ধ রইল। আমি বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসে আমাদের ঠাকুর-বাড়ীর নাটমন্দিরে দাঁড়ালাম।

এখান থেকে গোপালদাসীর বাড়ী দূরে। ঠাকুরবাড়ীর উত্তর-পশ্চিম কোণে দাঁড়ালে—সামনে পড়ে গোপালদাসীর সদর দরজা। উত্তর দিকে গলিপথে একটা প্রবেশ-পথ আছে গোপালদাসীর বাড়ীতে—সেখানটা এখান থেকে দেখা যায় না; তা না-যাক, আক্রমণকারী কেউ এলে সন্ন্যাসী চীৎকার করবেন না কিন্তু গোপালদাসী চীৎকার করবে।

দাঁড়িয়ে কতক্ষণ ছিলাম জানি না।

আগে যে বলেছি—ঝড়ের সম্মুখীন হতে পৃথিবীর স্তব্ধতার মত স্তব্ধ হয়ে যে প্রতীক্ষা, তেমনি প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়েছিলাম। সময়ের হিসাব করি নি।

মা যখন ডাকলেন তখন রাত্রি প্রায় দুপুর। ওই বড়বাবুদের বাড়ীতে এবং রাইস মিলে—ঘণ্টায় ঘণ্টায় ঘড়ি পেটা হ'ত। মা বললেন—এগারটা অনেকক্ষণ বেজে গেছে। প্রথম দুটো প্রহর যখন কেটে গেছে তখন ফাঁড়া কেটেছে আজকের মত। এরা যাই হোক—ডাকাত বা খুনে নয়। এরপর আর তারা আসবে না।

বাড়ী গেলাম। কিন্তু রাত্রে ঘুম হ'ল না। জেগেই রইলাম।

পরের দিনও কাটল।

তৃতীয় দিনে শুনলাম—ঝড় ও উত্তাপ মিলিয়ে গেছে। বাবু দুটি কলকাতা চলে গেছেন। সেইদিন অপরাহ্নেই শুনলাম, শূলপাণি বলেছে—যার যা খুসী করুক গে, আমার কি? তারাশঙ্কর এ কথাটা তো সত্যিই বলেছে, কার বাড়ীতে গুরু না আসে? আর সন্ন্যাসীর কথা যা ব'লেছে তাও সত্যি—ও মানুষ এমন হয় না। ওই ওরা এসে ধুয়ো তুললে—তার কি বলব? মদ-টদ খেলাম। তখন ওরা যা বললে তাই সত্যি মনে হ'ল। যাক গে। মরুক গে।

চতুর্থ দিনে শূলপানি সন্ন্যাসীর কাছে এসে ক্ষমা চেয়ে গেল।

সেই দিনই অপরাহ্ণে গোপালদাসী এল আমার কাছে।—তোমাকে বাবা একবার ডেকেছেন।

আমি বললাম—না। তাঁকে আমার নমস্কার জানিয়ো। আমি যাব না।

আমার কণ্ঠস্বরে এমন কিছু ছিল—যার জন্য গোপালদাসী দ্বিতীয়-বার অনুরোধ করতে পারলে না। শুধু ক্ষুণ্ণস্বরে বললে—যাবে না?

—না। আমাকে মাপ করতে ব'লো।

সে চলে গেল। আবার এল কিছুক্ষণ পর। বললে—তিনি বিশেষ করে বলেছেন; একবার তোমাকে যেতেই হবে।

বললাম—না। বলেই আমি বেরিয়ে চলে গেলাম। অনিচ্ছাটা দৃঢ়তার সঙ্গে জানাবার জন্যই চলে গেলাম। মনের মধ্যে যে অভিমান বা ক্ষোভ ছিল তাকে অস্বীকার করে নিজেকে নিজেই বললাম,—আমি আমার কর্তব্য করেছি। কোন প্রতিদানের আশা তো করি নি। সুতরাং কেন যাব? আমার কর্তব্য পালনের গৌরব বল গৌরব, পুণ্য বল পুণ্য, সেইটুকুকেই বা কেন ক্ষুণ্ণ বা ম্লান করব?

চুপ করে একা কিছুক্ষণ বসে রইলাম বৈঠকখানা বাড়ীতে। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। উঠলাম। যাব শ্মশানের দিকে। কিন্তু জুতো পায়ে

দেবার জন্যই বাড়ী ফিরতে হল। বাড়ীর দরজায় মা দাঁড়িয়েছিলেন। আমাকে দেখবামাত্র আমার হাত ধরে বললেন—আয়।

—কোথায়? বিস্মিত হয়েই প্রশ্ন করলাম। মা যে এইভাবে আমাকে সন্ন্যাসীর কাছে নিয়ে যাবেন এ কল্পনাও আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল। তিনি বললেন—গোপালদাসীর গুরুর কাছে।

—না। আমি দাঁড়ালাম থমকে।

মা বললেন—আমি তাঁর কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তোমাকে নিয়ে যাব, আমি কথা দিয়ে এসেছি। এরপরও তুমি না বলবে?

এক মুহূর্তে তুই থেকে তুমি হয়ে গিয়েছি। কণ্ঠস্বর তাঁর গাঢ় হয়ে উঠেছে। আর প্রতিবাদ করতে পারলাম না। গেলাম মায়ের সঙ্গে।

গোপালদাসীর ঘরে তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। প্রদীপ জ্বালছে গোপালদাসী। মা আমাকে নিয়ে ঘরে প্রবেশ ক'রে বললেন—বাবা, তারাশঙ্কর এসেছে!

—এসেছে? অগ্নিকুণ্ড-নিবদ্ধ দৃষ্টি মুহূর্তে ফিরল। প্রসন্ন কণ্ঠে আমাকে বললেন—এসেছ? বলেই তিনি উঠে দাঁড়ালেন। অগ্রসর হয়ে এলেন দু-পা, দীর্ঘ দুই হাত বাড়িয়ে আমার দক্ষিণ হাতখানি টেনে নিয়ে জড়িয়ে ধরে বললেন—তোমার কাছে আমার অপরাধ জমা হয়ে আছে। তুমি আমাকে মার্জনা কর।

সমস্ত ঘরখানাই যেন স্তম্ভিত হয়ে গেল।

চার

ঘর খানাই স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল এতে আমার কোন সন্দেহ নাই। বাস্তব সত্য হয় তো আমিই এমন স্তম্ভিত হয়েছিলাম যে আমার মনে হয়েছিল ঘরখানাই স্তম্ভিত হয়ে গেল। এবং সেটা বাস্তব সত্য না হলেও আমার কাছে পরম সত্য। কেন বলছি সেই কথাই বলি। গোপাল দাসীর সে ঘরখানা টিনের চালের ঘর। ঘরখানা গোপাল দাসীর নয়, গোপাল দাসীর খুড়োর। খুড়তুত ভাইয়েরা সক্ষম। তারা দুই ভাই কলিয়ারী অঞ্চলে থাকে, গোপাল দাসীর খুড়ো খুড়ী বউ নাতি নাতনীরাও সেখানে। দু বছর চার বছর অন্তর একবার আসে, কোন কোন বার আরও বিলম্ব হয়। তাই গোপাল দাসীর কাছে চাবী থাকে, ঘর ঝাড়বে মুছবে, তার উপর মাটির ঘর—ইঁদুরে কাটবে; তাতে মাটি দিতে হবে। দরজায় জানালায় উই ধরবে—ছাড়াতে হবে। এই ঘরেই গোপাল দাসী সন্ন্যাসীকে স্থান দিয়েছিল।

টিনের ঘরের অভিজ্ঞতা যাঁদের আছে তাঁরা জানেন টিনের ঘরে কেমন শব্দ হয়। একবার দিনের উত্তাপে উত্তপ্ত হলে—আর একবার রাত্রের হিমে ঠাণ্ডা হলে শব্দ আরম্ভ হয়—গরমে টিন বাড়ে; রাত্রের ঠাণ্ডায় সে আবার কমে আসে সশব্দে। সে যেন মনে হয় টিনের চাল মহেন্দ্রক্ষণে গড়া ঘরের মত কথা বলছে। বরাহ মিহিরের গল্পে আছে রাজা বিক্রমাদিত্যের একটা বিচিত্র বাড়ী ছিল। মধ্যরাত্রি হলেই কে যেন বলত—পড়ম্ পড়ম্। এর কারণ নির্ণয় হয় নি। এমন কি বরাহাচার্যের মত গুণীও নাকি পারেন নি। খনা এবং মিহির যখন রাজসভায় এলেন তখন তাদের পরিচয় বরাহাচার্যের কাছে অজ্ঞাত। তাদের বিস্তাবত্তার পরিচয় পেয়ে বরাহাচার্য সেই

পরিত্যক্ত বাড়ীতে স্থান দিলেন। রাত্রে শব্দ উঠতে লাগল—পড়ম্ পড়ম্। খনা তৎক্ষণাৎ বুঝলেন—এ-ঘর বিচিত্র ঘটনা সংস্থানে আরম্ভ হয়েছে মহেন্দ্রলগ্নে, শেষও হয়েছে মহেন্দ্রলগ্নে। এর ফল অদ্ভুত। খনা বললেন পড, কিন্তু আমাদের শয্যাটুকু বাদ দিয়ে। ঘর পডল। বিপুল শব্দ হল। নগরবাসী সে শব্দে চকিত হয়ে উঠে এসে দেখলে ইঁট কাঠ মাটি পাথর—সব সোনা হয়ে স্তূপীকৃত হয়ে আছে; তার মধ্যে একপাশে ঘুমুচ্ছে সেই বিচিত্র আগন্তুক দম্পতি।

টিনের ঘর পড়ম্ পড়ম্ বলে না, পড় বললে পড়েও না। কিন্তু ওই সন্ধ্যায় এবং ভোরে অবিরাম বলে—কাটাং কাটাং। কট কট কট। সেই সন্ধ্যার সময় যখন গোপাল দাসীর ঘরে সিঁড়ি ভেঙেছি তখনও সেই শব্দ শুনেছি। কিন্তু যে মুহূর্তের কথা বলছি সেই মুহূর্তে সে শব্দ ছিল না, আমি শুনি নি। আমার পৃথিবী তখন ওই ঘরখানির গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। বাহিরের জগত, বাহিরের জীবনের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক যেন নিঃশেষে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। আমি স্তব্ধ, আমার মা স্তব্ধ, গোপাল দাসী স্তব্ধ, তার হাত থেকে সদ্যজ্বালা প্রদীপটি পড়ে গেল মেঝের উপর, সঙ্গে সঙ্গে নিভে গেল, ঘরখানা মুহূর্তে ভ'রে গেল অন্ধকারে। আমি যেন মুহূর্তে মুহূর্তে হারিয়ে ফেলছি আমাকে। আমার অন্তরের মধ্যে প্রচণ্ড কম্পনে সব যেন ভেঙে চুরে ধূলিসাৎ হয়ে যাচ্ছে। আমার চোখের সামনে দাঁড়িয়ে দীর্ঘকায় অশীতিপর সন্ন্যাসীর মাথা যেন উর্দ্ধলোক থেকে সস্নেহে আনত হয়ে আমার মস্তক আঘ্রাণ করছেন বলে মনে হ'ল।

বোধ হয় মিনিটখানেক, তার বেশী নয় কিন্তু আমার স্মৃতিতে সে যেন একটা কাল মনে হয়েছিল, যেন জন্ম জন্মান্তরের তপস্যার সিদ্ধিফল আমার হাত ধরে এসে দাঁড়িয়েছিল।

প্রথমেই স্তব্ধতা ভঙ্গ করলেন আমার মা। তিনি বলে উঠলেন—প্রণাম কর, প্রণাম কর! তারপর অনুযোগ ক'রে বলে উঠলেন—এ আপনি কি করলেন বাবা?

আমি তখন প্রায় আত্মবিস্মৃত। আমি প্রণাম করব বলেই আনত হ'তে গেলাম, সন্ন্যাসী বললেন—না। এ ভাবে নয়। তুমি ত জান প্রণাম পদ্ধতি, সম্ভাষণ—বল নমো নারায়ণায়!

আমি তাই বললাম—নমো নারায়ণায়!

মা বললেন—না—না। ভূমিষ্ট হয়ে প্রণাম কর।

—না মা। না। আমি বলছি। বস আগে বস।

গোপাল দাসী আলো জ্বাললে এতক্ষণে। ঘরখানি প্রসন্ন মৃদু আলোয় ভরে উঠল। সন্ন্যাসী স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—সেদিন তোমাকে আমি কঠোর কথা বলেছিলাম। আমি শ্রান্ত ছিলাম পথশ্রমে। আমার যোগের সময় পার হয়ে যাচ্ছিল। চিত্তও অপ্রসন্ন হয়ে উঠেছিল। তখন আমি চাইছিলাম নির্জনতা, সেই সময় তুমি ওই কথা বললে। আমি বিচার না করে তোমাকে পরীক্ষা না করেই বললাম ওই কথা!

স্মিত হেসে বললেন—ভালই করেছিলাম। আমার মা যশোদা গোপাল দাসীর পথ—আর তোমার পথ তো এক নয়। আমি ভালই করেছি। তোমাকে দীক্ষা দিলে আমি ভুল করতাম। না হ'ত তোমার প্রকৃতিগত পথে সাধনায় সিদ্ধি, না হ'ত তোমার মন্ত্র জপে পরিতৃপ্তি। তোমাকে যেদিন আমি ডেকে বলেছিলাম, তুমি মন্ত্রদীক্ষা চেয়েছিলে কিন্তু কই তারপর আর এলে না কেন? সেদিন তুমি আমাকে যে উত্তর দিয়েছিলে—তাতেই আমি তোমার প্রথম আঁচ পেয়েছিলাম। অনেক কৌতূহল হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন কাউকে করি নি। বাবা, যখন প্রথম নিন্দা উঠল গ্রামে তখন কয়েকবার এও মনে হয়েছে যে, এর

মধ্যে তারাশঙ্কর নাই তো? তোমার সে দিনের কথার মধ্যে তোমার যে পরিচয় ছিল তাতে চমকে উঠেছি, মুগ্ধ হয়েছি, সঙ্গে সঙ্গে যেন একটু উত্তাপের আঁচ পেয়েছি। অভিমান হোক, ক্ষোভ হোক—যা হোক একটা ছিল। ও বস্তু যে ভয়ানক বাবা। ফসলের ক্ষেতে আগাছার মত ওর বৃদ্ধি। ফসল বাড়ে একগুণ, আগাছা বাড়ে দশগুণ। তাই বাবা সেদিন মা গোপালদাসী এসে যখন বললে, তারাশঙ্কর বলেছে সত্যকে সে অস্বীকার করতে পারে না। যে মিথ্যা গ্রামের লোক বলছে তার সে প্রতিবাদ করেছে—বলেছে—গোপালদাসীর সাধু বাবাকে অপমান করতে হ'লে তাকে অপমান করতে হবে আগে—তাকে নির্যাতন করতে গেলে সে আগে দরজা রুখে খাড়া হয়ে যাবে, তখন আমি মনে মনে বললাম—তারাশঙ্কর জিতে গেল! মানুষকে এমনি জিততে দেখলে মন বড় খুসী হয়। বড় আনন্দ হয়। তবে তুমি একটা মিথ্যা কথা বলেছ!

—মিথ্যা বলেছি? সবিনয়েই প্রশ্ন করলাম।

—হাঁ। আমাকে সেদিন বলেছ তুমি মৃৎপাত্র। হাসতে লাগলেন তিনি।

—মৃৎপাত্র না-হলেও স্বর্ণপাত্র আমি এ অহঙ্কার বা বিশ্বাস আমার নাই। আমার খাদ অনেক।

—সেই তো বাবা। তোমাকে তাই তো অনেক দহনে দগ্ধ হ'তে হবে।

আমি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললাম।

—আমি শুনেছি তোমার একটি কন্যা মারা গিয়েছে। বড় আঘাত পেয়েছ।

চোখ দিয়ে আমার জল গড়িয়ে এল।

—তুমি শ্মশানের ধারে গিয়ে বসে থাক। কি খোঁজ? মেয়েকে?

উত্তর দিতে পারলাম না। নিজেকে সংযত করবার চেষ্টা করলাম।

—মেলে না ভাই। ও দেখা মেলে না।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে এবার বললাম—কিন্তু মন মানে না। না গিয়ে পারি না।

—পারবে। পারতে হবে। আর ভাই, দেখা যদি মিলবার হয় তবে কি শ্মশানেই মিলবে, ঘরে মিলবে না? তবে আর সে কি মেলা?

আমার গায়ে হাত খানি রাখলেন, বুলিয়ে দিলেন জননীর স্নেহে। বললেন—এ বুড়ো সাধুর বাত রাখবে বাবা। শ্মশানে যাবে না। কেমন? গেলে আমি দুখ পাব।

আমি হেসে বললাম—আমি চেষ্টা করব। না যাবারই চেষ্টা করব।

—বাস। বাস্। ওতেই হবে। আর এক বাত ভাই, দুনিয়াতে এই সত্যকে মাথায় ক'রে চলবে ভাই। যাচাই না-ক'রে কাউকে বলো না আমাকে দীক্সা দাও। দীক্সা তোমার হয়ে গিয়েছে। এ বাত আমার কাছে শুনে রাখ। যদি কোনদিন এ দীক্সায় সাধন তোমার অসাধ্য হয়, সেদিন গুরু তোমার আপনি মিলবে। আরও এক বাত শুনো। আপনা পথ যে চলো, পথ দেখানেওয়ালা তোমার পথে খাড়া আছে।

আমি সেদিন বিগলিত হয়ে গিয়েছি এমন অবস্থা আমার। আমার অহঙ্কার ছিল না, অভিমান না, অতৃপ্তি না; সে এক অদ্ভুত অবস্থা। দুটি চোখ যেন ঘুমে ভরে আসছে। মনে হ'ল সেইখানেই শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ি।

কয়েক মুহূর্ত পরেই সন্ন্যাসী বললেন—আমি ভাই এখন একবার জপে বসব। আমার কাছে এস, আচ্ছা ভাই, যখন খুসী হবে তখন আসবে।

আমি হাত জোড় করে বললাম—নমো নারায়ণায়।

—নমো নারায়ণায়। সন্ন্যাসী বললেন—আজ তো ভাই, ঠিক ঠিক 'নমো নারায়ণায়' হল। বলেই উঠে তিনি আমাকে টেনে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

হয় শূন্য নয় পূর্ণ মন নিয়ে গোপালদাসীর বাড়ী থেকে বেরিয়ে এলাম। আজও সেই অনুভূতিকে আস্বাদন করেই বলছি—শূন্যতায় মনের অবস্থা এক। সমস্ত বিশ্ব সংসার মনের মধ্যে এসে ধরা যখন দেয় তখন বাইরের পৃথিবীর অস্তিত্বই থাকে না। অসীম শূন্যের মধ্যে তখন মানুষ একা। তাও সে ঘুমন্ত তন্দ্রাচ্ছন্ন, সে অপার প্রসন্নতাতেই হোক, সীমাহীন বিষণ্ণতাতেই হোক।

বাইরেও সে দিন যেন পৃথিবী পরিপূর্ণতায় ঝলমল করছে। পূর্ণিমা সে দিন। জ্যোৎস্নার এমন আকর্ষণ আর কথনও অনুভব করি নি। ভিতরে বাহিরে যেন একাকার হয়ে গিয়েছে বলে মনে হল। আমি তন্দ্রাচ্ছন্নের মতই গ্রাম থেকে বেরিয়ে এলাম। এসে হঠাৎ এক জায়গায় দাঁড়ালাম। দাঁড়াতে যেন বাধ্য হলাম। কানের পাশে যেন শুনলাম সন্ন্যাসীর কথা। এ বুড়া সাধুর একটি কথা রাখবে বাবা!

যেখানে দাঁড়িয়েছি সেখান থেকেই একটা পথ চলে গিয়েছে শ্মশানে, একটা গিয়েছে পশ্চিম মুখে। পশ্চিম মুখে কিছু দূরেই আমাদের সেই বাগান, যে বাগানের কথা এর আগে বলেছি। বাবার প্রতিষ্ঠিত তারামায়ের আশ্রম। যার কথা আমার ধাত্রী দেবতার প্রথমেই আছে।

—শ্মশানে যাবে না বাবা!

দিক পরিবর্তন করলাম। আপন অজ্ঞাতসারে পূর্বমুখেই পা বাড়িয়েছিলাম। দিক পরিবর্তন ক'রে পশ্চিমদিকের পথ ধরে বাগানে

ঢুকে অবারিত প্রান্তর সামনে রেখে এসে বসলাম। স্তব্ধ হয়ে বসে রইলাম। দৃষ্টি রুদ্ধ হয়েছিল, শোনবার শক্তি রুদ্ধ হয়েছিল, স্পর্শ শক্তিও বোধ করি ছিল না। এমনি বিচিত্র অবস্থার একটি অস্পষ্ট স্মৃতি আজ স্মরণ হচ্ছে। এমনি অবস্থার মধ্যে আমার মনে হচ্ছে যেন বুলুকে আমার ফিরে পেয়েছিলাম বলে মনে হয়েছিল। তার স্পর্শ অনুভব করি নি, তাকে ছুঁইনি, তার কথা শুনি নি, আমি কিছু বলি নি, তাকে চোখে দেখি নি, তবু যে এমন কি ক'রে কেন মনে হয়েছিল সে আমি জানি না। কারণও আমি ব্যাখ্যা করতে পারব না। তবে মনে হয়েছিল। আমি তাকে পেয়েছিলাম, অনুভব করেছিলাম—সকল মন দিয়ে, পরিপূর্ণ অন্তর দিয়ে আত্মার ইন্দ্রিয় যদি থাকে—তাই দিয়ে তাকে পেয়েছিলাম। এবং শুধুই কেঁদেছিলাম। অনর্গল চোখের জলে মুখ বুক ভেসে গিয়েছিল। সে পাওয়ার আনন্দ পুলক অপূর্ব অপরূপ, প্রতিটি রোমকূপ শিহরণে শিহরণে সে আনন্দ আস্বাদন করেছিল, তার স্মৃতি আজও স্পষ্ট প্রত্যক্ষ।

আকাশের চাঁদ মাথার কাছে এল প্রায়। দক্ষিণে পূর্বে ঢালু জমি চলে গিয়েছে নদীর কূল পর্যন্ত ; নদীর ওপারে গ্রাম বনরেখা, পশ্চিমেও উঁচু প্রান্তর, প্রান্তরের মধ্যে সেই উদাসী পুকুর। পুকুরের পাড়ের উপর সারি সারি তালগাছ। দুধ সাগরের মত জ্যোৎস্নার বন্যা বয়ে যাচ্ছে এই সবের উপর দিয়ে। সব মনে রয়েছে। সব স্পষ্ট। তার মধ্যে এই অনুভূতিও স্পষ্ট।

জীবন এবং মৃত্যুতে যেন একাকার। সেতু বাঁধা হয়ে গিয়েছিল। সেই সেতুর মুখে বসে ছিলাম আমি। সেতু বেয়ে যেন এসেছিল বুলু। মহা বিচিত্র যেন তুলে দিলে তার যবনিকা।

কতক্ষণ? অন্তত তখন এগারটা। এসে ডাকলে যেন কে। বোধ হয় শচী। শচী বলে একজন চাকর ছিল। সে এবং আরও

একজন—অমর। অমর আমাদের বাড়ীতে থাকত, বাড়ীতে খেয়ে ইস্কুলে পড়ত।

তন্দ্রাচ্ছন্নের মতই বাড়ী ফিরে এলাম। তারই মধ্যেই খেলাম। শুলাম। অগাধ ঘুমে ঘুমিয়ে পড়লাম।

সকালে উঠলাম। মনে হ'ল এমন প্রসন্ন জীবন দীর্ঘকাল আমি পাই নি। জীবনের ক্ষোভ অভিমান শোক শান্ত হয়ে গেছে, মিলিয়ে গেছে, জুড়িয়ে গেছে। বুলু যেন হারায় নি। কেউ যেন কখনও আমাকে দুঃখ দেয় নি। এমনি প্রসন্ন জীবন। ফুলে ভরা বাগানের মত আনন্দে তৃপ্তিতে ঝলমল মন।

এমন পাওয়া কখনও আমি পাই নি।

সে দিন সন্ধ্যায় সন্ন্যাসীর কাছে গিয়েছিলাম। তিনি বললেন—কাল শ্মশানে যাও নি তো বাবা ?

—না।

—আনন্দে রহো। খুসী হয়েছি। ভাল করেছ। কাল গেলে—তুমি হয় তো ভয় পেতে।

—ভয় পেতাম ? বিস্মিত হলাম।

—হাঁ বাবা। ওইখানেই তো তোমার কন্যার শেষ কৃত্য হয়েছে। পূর্ণিমা গিয়েছে কাল। হয় তো গাছের ফাঁকে জ্যোৎস্না দেখে মনে হত—কন্যা বুঝি দাঁড়িয়ে আছে। ভয় পেতে। বাবা—মৃত মানুষ—হোক পরম প্রিয়জন—তাকে হঠাৎ দেখলে—মানুষ ভয় পায়। না পেলে—কাছে গিয়ে দেখতে কন্যা নয়—ছায়া। দুঃখ বাড়ত। ভাল করেছ। ও নিয়ে দুঃখ আর করো না।

অনেকক্ষণ তাঁর দিকে চেয়ে থেকে বললাম—না, দুঃখ আমার আর নাই!

—রাম—রাম! সীতারাম। সীতারাম।

পাঁচ

এরও অনেক দিন পর তিনি আমাকে বলেছিলেন—বাবা, সে দিন শ্মশানে গেলে তোমার ভয় পাওয়ারই কথা ছিল। ভয় যদি নাও পেতে—তবে শ্মশানের আকর্ষণ তোমার বাড়ত। তার অনিবার্য পরিণতি ছিল সন্ন্যাসী হয়ে যেতে তুমি। কিন্তু তাতেও তো তোমার কাজ হ'ত না। তাই বারণ করেছিলাম।

এই সন্ন্যাসীর সঙ্গে ওই ঘটনার পরও কয়েকবার দেখা হয়েছে। কিন্তু তাঁর সংস্পর্শে এসে ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে যে আস্বাদন পেয়েছিলাম—সে আস্বাদন অমৃতের। আমার যে যে কন্যার শোকে আমি প্রায় উদাসী হয়ে উঠেছিলাম, মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্ব এবং রহস্য অনুসন্ধানের অভিপ্রায়ে সন্ধ্যার পর সন্ধ্যা শ্মশানে কাটিয়ে এসেছি অথচ কোন সন্ধানই পাই নি, যে অবস্থাটাকে বলতে পারি শোকাচ্ছন্নতা শাস্ত্র মতে যা নাকি মূঢ়তার সামিল—তাই থেকে মুক্তি পেলাম—এক পূর্ণিমা রাত্রের অমৃত আস্বাদনে। কেমন ক'রে হয়েছিল তা' জানি না তবে হয়েছিল। হয় তো বা সবটাই মনের খেলা, ভ্রান্তি; সে দিন ঐ সন্ন্যাসীর মত এক মহিমময় পুরুষ আমার কাছে নতি স্বীকার করেছিলেন—আমাকে মহৎ বলে স্বীকার করেছিলেন, আমার অহং পরিতৃপ্ত হয়েছিল, সেই কারণেই হয় তো সে দিন এমন তৃপ্তির আনন্দ অনুভব করেছিলাম, এবং সেই পরিতৃপ্তির মাদকতার মধ্যেই কন্যা শোক বিস্মৃত হয়েছিলাম এমনও হতে পারে, অন্তত কেউ যদি এমন ব্যাখ্যাই করেন তাতে বাদ প্রতিবাদ করব না এমন কি বিজ্ঞ ভাবে বলব না—There are more things in heaven and earth than are dreamt of in your philosophy, তার সঙ্গে যোগ করে দেব and science;

এ ক্ষেত্রে আমার একমাত্র বক্তব্য হল—ছলনা হোক—ভ্রান্তি হোক—আমার সে দিনের আনন্দ সত্য, অমৃতের আস্বাদন-স্মৃতি আমার কাছে অক্ষয় হয়ে রয়েছে। এর পর আমার ভাগ্যে আরও তিনটি সন্তান বিয়োগ ঘটেছে—কিন্তু তাতে আমাকে আর এমন ভাবে অভিভূত করতে পারে নি।

শেষ সন্তান বিয়োগ ঘটে, বোধ করি ১৯৩৮ সালের পূজার পরই কোজাগরী পূর্ণিমা বা তার পরদিন; বেলা এগারটা সাড়ে এগারটায় ছেলেটি মারা যায়—সৎকার ইত্যাদি শেষ হতে বেলা আড়াইটে বেজে গেল, চারটে নাগাদ বন্ধু বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এসে ডেকে নিয়ে গেলেন—চল বেড়াতে যাই। হেসেই বললাম—চল। বেরিয়ে ষ্টেশনের কাছাকাছি এসেছি—দেখা হ'ল ষ্টেশনের রাজা মিয়ার সঙ্গে; রাজা মিয়া ষ্টেশনের একমাত্র হাতে কলমে কাজ করবার লোক; সিগন্যাল টানে—তোলে, লাইন ক্লিয়ার দেয়, বাতি জ্বালে, তেল পোরে আবার টেলিগ্রাম এলে তাও বিলি ক'রে আসে। রাজা মিয়া আমায় সেলাম করে একখানি টেলিগ্রাম হাতে দিলে। টেলিগ্রাম করেছেন—আমাদের নলিনীদা; হাস্যরসিক—রসরচনায় সিদ্ধহস্ত—গায়ক শ্রীযুক্ত নলিনী কান্ত সরকার। "কাজী নজরুল এবং আমি আজই রাত্রে তোমার ওখানে যাচ্ছি।"

হেসেই বাড়ী ফিরেছিলাম বন্দোবস্ত করবার জন্য। বন্দোবস্ত করে রান্না করিয়ে রাত্রে ষ্টেশনে গেলাম। কাজী আর নলিনীদা নামলেন, প্রসন্ন মুখেই অভ্যর্থনা জানালাম। তাঁরাও আমার সঙ্গে কয়েকটি কথা বলেই হঠাৎ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে—কাজীই বলেছিলেন—যাক্ বাঁচলাম। ছেলেটি তা' হলে ভাল আছে।

ছেলের অসুখের সংবাদ তাঁরা কলকাতায় সজনীকান্ত এবং সুবল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে পেয়েই গিয়েছিলাম—কিন্তু এমন সময়

পেয়েছিলেন যে, তাঁদের প্রোগ্রাম পাল্টাবার সময় ছিল না। কাজী ওখানে গিয়েছিলেন বাতের ঔষধের জন্য। তাঁর স্ত্রী কঠিন বাত-ব্যাধিতে পঙ্গু, (আজও তিনি পঙ্গু) তখন প্রায় বৎসর কয়েকই চলে গেছে, কোন চিকিৎসাতেই কোন উপকার হয় নি, কলকাতার কোন বড় চিকিৎসক বাদ যান নি ; এ্যালোপ্যাথি, কবিরাজী, হোমিওপ্যাথি, হাইড্রোপ্যাথি—হকিমী তারও কোনটা বাদ পড়েনি—শেষে দৈব ঔষধে ভরসা করেছেন—এবং বেলের ধর্মরাজের ওখানকার বাতের ঔষধ সংগ্রহের জন্য আমার ওখানে গেছেন। আমাদের ওখানের সম্পর্কে কাজীর ধারণা খুব ভাল নয়, বলতেন—গোকর্ণের কাছাকাছি ও অঞ্চল সবটাই গোকর্ণ—ওখানে কে কার মেসো? কবি বলে সমাদরের কোন সম্ভাবনা নেই। তার কারণ আছে—সে থাক। তার উল্লেখে সুর কাটবে। যে কথাটা বলতে চাইছিলাম—সেটা হ'ল এই, একেবারে প্রায় যাওয়ার ঠিক আগেই খবরটা পেয়ে—তাঁরা যাওয়া স্থগিত রাখতে পারেন নি, মনে মনে সন্তানটির আরোগ্য কামনা করেছিলেন, আর ভেবেছিলেন—নেহাত যদি কোন দুর্ঘটনা ঘটেই থাকে—তবে তাঁরা আমাকে বলবেন, ডাকবাংলায় ব্যবস্থা করে দিতে। ষ্টেশনে নেমে আমার সঙ্গে কথা বলে আমার কথাবার্তায় কোন চাঞ্চল্য লক্ষ্য না ক'রে, সহাস্য মুখেই তাঁদের অভ্যর্থনা করতে দেখে তাঁরা ভেবেছিলেন ছেলেটি ভাল আছে।

এইটুকু আমার ওই অমৃত আস্বাদনের ফল বলেই আমি বিশ্বাস করি। তাই বলছি—ভ্রান্তিই হোক, মিথ্যাই হোক, ছলনাই হোক, তার মধ্য থেকেই যা পেয়েছি তার প্রভাব মিথ্যা নয়। শোকে উদাসীন অবশ্যই হই। কিন্তু মুহ্যমানতা থেকে আত্মসম্বরণের শক্তি ওই থেকেই আমি পেয়েছি। এই ছাড়াও কিছুদিনের জন্য এই জ্ঞানযোগীটিকে পেয়েছিলাম নিবিড় ভাবে।

এই পাওয়ার মধ্যে একটি কথা বুঝেছিলাম। বলেছিলেন তিনিই। নানা কথার মধ্যে মহাত্মার কথা রবীন্দ্রনাথের কথাও হয়েছে, বড় বড় মহাপুরুষের কথাও হয়েছে, এই প্রসঙ্গেই তিনি বলেছিলেন, দেখো ভাই এই সব মানুষের ভিতর ভগবানের লীলার প্রকাশ হয়। খুব বড় বন দেখেছ? দেখ নি? দেখো ভাই, অরণ্য দেখে এসো। এক একটি গাছ দেখবে সব কিছুকে ছাড়িয়ে উঠেছে, তার ফুল দেখো, ফল দেখো, একেবারে সমারোহ। ভগবানের মহিমার সেও প্রকাশ। মানুষের ভিতর তার প্রকাশ আলাদা। সে প্রকাশ হ'ল মহিমার প্রকাশ। সব মানুষের মধ্যেই চলছে সেই প্রকাশ; সে শক্তিকে তুমি অন্ধকারের পথে চালাও—সে হবে, হতে চাইবে অজগর; আবার আলোর পথে চালাও, সে হবে ধবলগিরি, কাঞ্চনজঙ্ঘা, কৈলাস।

এমনি একটি মহিমার প্রকাশ তাঁর মধ্যেও ছিল।

তিনি বলেছিলেন—ভাই, বনে যাই, নির্জ্জনে নিজের অন্তরের মধ্যে মহিমাকে প্রকাশিত হবার সুযোগ দিতে। এই সংসারের ঘটনার আকর্ষণ থেকে বাঁচিয়ে রাখতে নিজেকে। ভাই, যে ঘটনায় তুমি নিজেকে জড়াবে তার ফল তার ক্রিয়া তোমার ভিতরে হতেই হবে। বৃক্ষের বীজ, জীবনের বীজও নিষ্ফলা হয় কিন্তু কর্মের বীজ অমোঘ। তার অঙ্কুর উদ্গত হবেই, সেই পাতা মেলবে, ফুল হবে—ফল হবে। বিষবৃক্ষের বীজ হয়, তার ফল তোমার মধ্যে তোমার বংশের মধ্যে ফলবেই। সেই তো ভাই, সেই জন্যেই তো সাধন দরকার। তুমি সৎকর্মের সাধন কর তোমার বংশের মধ্যে থাকবে তার পুণ্য। তুমি ভয়ঙ্করের সাধন করো, তোমার বংশের মধ্যে থাকবে তার খেলা। কর্ম হারায় না ভাই।

এই কথাটি আমি পদচিহ্নের মধ্যে এক সন্ন্যাসী চরিত্রের মুখ দিয়ে বলেছি। তিনি বলেছেন কর্ম হারায় না বাবা, কর্মের শেষ

কর্মফলেই নয়, তার ফলেও ক্রিয়া উৎপন্ন হয়, সেও দেয় ফল তাতে হয় নূতন ক্রিয়া; আর যে কর্ম তুমি কর তার মূল তার উদ্ভবও আজ নয়, পিছনে খুঁজলে পাবে শত সহস্র বৎসরের কর্মের পর কর্ম। তাই তো আমরা জন্মজন্মান্তরেও কর্মসূত্রে গাঁথা, সেই জন্যই তো কর্ম থেকে মুক্তিই নির্বাণের সিংহদ্বার। কিন্তু কর্ম রোধ তো বাসনা অন্তরে থাকতে হয় না। বাসনা অন্তরে থাকতে কর্ম-রোধ আলস্য

সন্ন্যাসী আমাকে বলেছেন—শক্তির প্রকাশ আলোয় অন্ধকারে, সত্ত্ব ভাবে সাধনা কর ভাই—জীবনে সূর্যোদয় হবে, তম ভাবে সাধনা কর অন্ধকার নামে। বনের জানোয়ার বাঘ ভাল্লুক অজগর এদের কর্ম-সাধনার প্রশস্ত কাল তাই রাত্রি। মানুষের জগতেও সেই খেলা, সেই লীলা চলছে অহরহ। আলোর সাধনা করতে করতে মতিভ্রমে একটি পাপ কর—অন্ধকারকে বারেকের জন্য আশ্রয় কর—দেখবে ওই হয়ে গেল—গ্রহণ লাগল, ওই রাহু তোমার জীবনে অধিকার পেয়ে গেল। দেখবে মধ্যে মধ্যে হঠাৎ রাহু হাঁ করে এসে তোমার সূর্য চন্দ্রকে গিলবে। এ থেকে মুক্তি বড় কঠিন। ওই গ্রহণ যে লাগে সে শুধু তোমার কর্মহেতুই নয়—কোন ভূতকালে তোমার কোন পূর্বপুরুষ কোন কর্ম করেছিল তার সঙ্গে তোমার ওই কর্ম করার যোগ আছে। তাই তো ভাই, যে মানুষ জীবনে আলোর সাধনা করে তাকে বলে কুলপ্রদীপ, আর যে অন্ধকারের সাধনা করে তাকে বলে—কুলাঙ্গার—অঙ্গার তো কালো ভাই।

বোধ করি তিন চার বৎসর তাঁর সঙ্গে মধ্যে মধ্যে দেখা হয়েছে, এমনি ধরণের অনেক কথা তাঁর কাছে শুনেছি। দেখেছি তাঁর মধ্যে এক জ্যোতির্ময়ের প্রকাশের আভাস।

তাঁকে আমি তন্ত্র-সাধনার কথা জিজ্ঞাসা করেছিলাম।

তিনি নিজে ছিলেন যোগী এবং সাধনা ছিল একেবারে বৈদিক। শুদ্ধতার শুচিতার সাধনা। কোন অলৌকিক শক্তি-লাভের জন্য ব্যগ্রতা তাঁর ছিল না। যে শক্তি তাঁর মধ্যে দেখেছি তা তাঁর বার্দ্ধক্য এবং জরা-জয়ের মধ্যে দেহের সক্ষমতার দীপ্তিতে এবং চিত্তের দৃঢ়তায়, মাধুর্যে, তেজস্বিতায় প্রকাশমান দেখছি।

তৃতীয় পর্ব

(এক)

তন্ত্রের কথায় তিনি বলেছিলেন, একটু হেসেই বলেছিলেন—এ দেশ তো তোমাদের ভাই তান্ত্রিকের দেশ। সবাই দেখি তান্ত্রিক। মহাপীঠে যায়, ছিলেমের পর ছিলম গাঞ্জা খায়। মদ খায়। মুখে অশ্লীল কথা বলে, কপালে সিন্দুরের ফোটা পরে। কেউ কেউ রুদ্রাক্ষের মালা ভি পরে—আর তারা তারা কালী কালী বলে চীৎকার করে। তোমারও দেখি তন্ত্রে টান রয়েছে। থাকবারই কথা ভাই। দেশের প্রভাব, তোমাদের বংশের প্রভাব—ওই ভাই কর্মের জের। তন্ত্র বড় কঠিন কথা ভাই। সব সে সিধা পথ—আর সব সে কঠিন পথ। মনে ভেবে নাও ভাই, অমাবস্থার রাত্রি—এমন অমাবস্থা যে আকাশে নক্ষত্র পর্যন্ত নাই, অগ্নি নাই, এই অন্ধকারের মধ্যে তোমাকে জ্যোতিকে ফুটাতে হবে। সূর্য চন্দ্রের জ্যোতি নয়, কালোর মধ্যে যে আলো আছে জ্যোতি আছে সেই জ্যোতি। কালোর মধ্যে আলোর সন্ধান কি সহজ রে ভাই? তা হ'লে তো জন্তু জানোয়ার চোর ডাকাত সাপ খোপ সবাই সিদ্ধ হ'তরে দাদা। ও অন্ধকারের মধ্যে আসন ক'রে বসলেই অন্ধকারের নেশায় পেয়ে বসে। দেখ না ভাই, আলোর সাধনা যারা ক'রে—তাদের আলোর নেশা কেমন? সুরয দেবতার আলো সে জানালা এঁটে রোধ ক'রে ঘরের মধ্যে বিজলী বাতি ঝাড় লণ্ঠন জেলে বসে থাকে। মহাশক্তি যখন অন্ধকারের মধ্যে লীলা ক'রে তখন তার মত হিংস্র, তার মত ভয়ঙ্কর তার মত উন্মাদিনী আর কিছু নাই, হয় না, কল্পনা করতে পারে না। ও পথ তোমার নয় রে ভাই। তুমি নিজে একটা পথ ধরে নিয়েছ আর ওপথের দিকে তাকিয়ো না। ভাই, তোমাকে আমি

শ্মশানে যেতে বারণ করেছিলাম। মনের ক্ষুধা তোমার বড় প্রবল—সেই ক্ষুধার টানে ওই দিকে পা বাড়ালে ওই সুধা—ওই সুধা ব'লে তুমি ছুটতেই, সন্ন্যাসী হয়ে যেতেই, অথচ আঁধার তোমার সহ্য হত না, পাগল হয়ে যেতে নয় তো আঁধারের নেশায় হয়ে যেতে বাঘ কি সাপের মত জীব। চৈতন্য হারিয়ে যেত; জীবন ডুবে যেত তান্ত্রিক ভোগের মধ্যে, জীব জন্তু বনে যেতে। জীব জন্তুর মতই মানুষও বড় অসহায় রে ভাই। মনে হয় তাদের চেয়েও মানুষের দুঃখ বেশী। জীব জন্তুর ভিতর মহাশক্তি পাগল খেলা আছে। লড়াই নাই। মানুষের ভিতর আছে লড়াই। মহাশক্তি যে কি উন্মত্ত খেলা খেলে তাদের মধ্যে—আঃ—তা থৈ তা থৈ নাচনরে দাদা! কত ঋষি কত মুনি কত সাধক কোটী কোটী বরষ ধ'রে কত তপ কত হোম কত যজ্ঞ করে, অজ্ঞান তামসীর মধ্যে থেকে চৈতন্য শূন্যতার অন্ধকারের মধ্যে থেকে আবিষ্কার করলে চৈতন্যময় আদিত্যবর্ণ সত্তাকে মানুষের মধ্যে তিনিই আত্মা; আদিত্যবর্ণ পুরুষ মহাশক্তি তাকে অহরহ অবসন্ন করে দিতে চাইছে। পাপ পুণ্য ও সব কথা বাদ দাও ভাই। আসল লড়াই ওইখানে। ওই চৈতন্যময় আদিত্যবর্ণ পুরুষের সঙ্গে তমিস্রা রূপিনী মহাশক্তির। দেখ না ভাই আকাশে তাকিয়ে—যেখানেই মহাশূন্যে মহাতমিস্রার মধ্যে সৃষ্টি। সেইখানেই দেখতে পাবে দীপ্তির স্ফুরণ আদিত্যবর্ণ বিন্দু ছটা—পৃথিবীতে জীবনকে আশ্রয় করে সে সৃষ্টি ফুটেছে জীবদেহের মধ্যে; উদ্ভিদের মধ্যে; উদ্ভিদে তার জ্যোতি পুষ্পে ফলে। জীবদেহে জ্যোতি রূপে এবং সেখানে তার প্রকাশ আরও স্পষ্ট চেতনায়, তারপর চৈতন্যে। চৈতন্যের মধ্যেই আছে সেই জ্যোতি। এই পৃথিবীর সৃষ্টি ধ্বংস হবার আগে মানুষ যদি চৈতন্যময় পুরুষকে অমর করতে পারে—তবে তো ভাই মানুষের তন্ত্র সাধনা হল সার্থক। ভাইরে কালীকে হতে হবে মহালক্ষ্মী—তা

হ'লে তো শুধু এই পৃথিবী নয় বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বাঁচল, পেয়ে গেল পরম অবস্থা। নইলে চলল খেলা! চলল! কাল অনন্ত—কালীর নাচন অবিরাম! তা থৈ—তা থৈ—তা থৈ—তা থৈ! আদিত্যবর্ণ পুরুষ তারই মধ্যে কখনও তাদেরই মধ্যে মিশে যাচ্ছেন, ঘুমিয়ে পড়ছেন কি গর্ভস্থ ভ্রূণের মত কালীর কুক্ষিগত হচ্ছেন—আবার কখনও জাগছেন কি জন্ম নিচ্ছেন কালীর কুক্ষি থেকে—আর কালী জন্তুমাতার মত তাকে গ্রাস করবার চেষ্টা করছেন; লাগছে লড়াই আবার।

তাঁর সকল কথা ঠিক প্রকাশ করতে পারলাম কিনা নিজে ঠিক বুঝতে পারছি না আজ। তবে তাঁর কাছে শোনা কথা গুলি আমার মনের ভাবনার বৃক্ষে এই ভাব-পুষ্পের রূপেই বিকশিত হয়েছে তাই বললাম।

জীবনে বিচিত্র প্রত্যক্ষের বা অনুভবের কথারম্ভের প্রথমেই আমি লিখেছি এই ষড়ৈশ্বর্যশালিনী বিশ্ব-পৃথিবীতে অনন্ত রূপ রহস্যের নিরন্তর যে বিচিত্রের আত্মপ্রকাশ চলেছে তার ভিতরে মানুষের মধ্যে তাঁর প্রকাশ আমাকে আকৃষ্ট করে বেশী। একটি পুষ্পিত বৃক্ষ অথবা কোটী কোটী কীট পতঙ্গের ঐক্যতান-মুখরিত অথচ মহাশূন্যের মত স্তব্ধ শান্ত গভীর অরণ্যের মধ্যে বা মহাতরঙ্গের মত লীলায়িত মহিমায় বহু যোজন বিস্তারি পার্বত্য প্রদেশের মহিমার মধ্যে যে বিচিত্রের আকর্ষণ অন্যে আকর্ষণ করেন আমি ঠিক তেমনি ভাবেই বিচিত্রের আকর্ষণ অনুভব করি জনারণ্যের মধ্যে। এ কথা আমি আগেই বলেছি।

মানুষের মধ্যে তার সেই এক প্রকাশের কথাই এবার বলব। এবং ওই সন্ন্যাসী আমাকে যে কথাগুলি বলেছিলেন—তারই প্রভাবে আমি একে দেখেছি। আমার কাছে বিচিত্রের এক বিস্ময়কর প্রকাশ বলে প্রতিভাত হয়েছে। অন্যের কাছে হয়তো তা মনে না হতে পারে;

হয়তো শুধু একটি রোমাঞ্চকর ঘটনা বলেই মনে হবে কিন্তু আমি বিচিত্রের সন্ধান এরই মধ্যে পেয়েছি।

সন্ন্যাসী বলেছিলেন—যে ঘটনা ঘটে সে সুন্দরই হোক, কল্যাণকরই হোক আর ভয়ঙ্কর অকল্যাণকরই হোক—তার মূল আছে ভূত কালে, পরিণতি আছে ভবিষ্যতে—অর্থাৎ সৃষ্টির আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত কর্মের ধারা প্রবাহিত হয়ে চলেছে। তারই মধ্যে চলেছে ওই উন্মাদিনী কালীরূপিনী মহাশক্তি ও চৈতন্যময় আদিত্যবর্ণ পুরুষের দ্বন্দ্ব। একবার অন্ধকারকে আশ্রয় করলে আর নিস্তার নাই, বার বার সে রাহুর মত আসবে, গ্রাস করবে জীবনের জ্যোতির্ময়কে। জ্যোতির্ময় মুক্তি পাবেন কিন্তু আবার আসবে রাহু তাঁকে গ্রাস করতে; আবার অসহায়ের মত তাঁকে আত্মসমর্পণ করতে হবে। এরই মধ্যে কত মানুষ কত মানুষের বংশধারা আকাশের কত নক্ষত্রের মত নির্বাপিত হয়ে যাচ্ছে; আবার কত নীহারিকা ক্রমে দ্যুতিমান হয়ে উঠছে বাষ্পময় অবস্থা থেকে।

আজ থেকে, সাতচল্লিশ বৎসর আগে। ১৯০৬ সালের মে অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠ মাসে একটি ঘটনা ঘটেছিল আমাদের লাভপুরে। আমার বয়স তখন আট বৎসর।

একটি খুন হয়ে গেল লাভপুরে। ডাকাতির সঙ্গে খুন। একেবারে লাভপুর থানার সামনে একশো ফুটের মধ্যে। এই পঞ্চাশ গজ স্থান একেবারে খোলা—কোথাও কোন বাধা বন্ধ নাই। চৌরঙ্গী রোডে মেট্রো সিনেমার সামনে এসপ্ল্যানেডের ময়দানের মধ্যে কয়েকটা ছোট গাছ আছে, একটা লোহার রেলিং আছে, এখানে তাও নেই। থানার বারান্দার পরেই খোলা খানিকটা জায়গা, তারপর বিশ ফুট রাস্তা, রাস্তার উপরেই পাশাপাশি তিনখানি বাড়ী। তিনখানি বাড়ীরই সামনে এক একটি বাঁশের খুঁটি দেওয়া খড়ো চাল বারান্দা—আমাদের

দেশে বলে পিঁড়ে। তিনখানি বাড়ীর মধ্যে ব্যবধান 'পানিপাতনের' জায়গার অর্থাৎ খড়ের চালের জল পড়বার জায়গার। ও দেশে পানিপাতনের জায়গার পরিমাণ নির্দিষ্ট পাঁচ পোয়া অর্থাৎ এক হাত ও এক হাতের সিকি—বিশ ইঞ্চি হাতের মাপে পঁচিশ ইঞ্চি; প্রত্যেক ঘর তৈরীর সময় এই জায়গাটা চালের জল পড়বার জন্য ফেলে রেখে বনিয়াদ পত্তন করতে হয়। কেউ কেউ সাত পোয়াও রেখে থাকেন। এই হিসেবে প্রতি বাড়ী ও বারান্দা থেকে অন্য বাড়ী বারান্দার ব্যবধান পঞ্চাশ ইঞ্চি থেকে সত্তোর ইঞ্চি—সওয়া চার ফুট থেকে কিছু-কম ছ ফুট পর্যন্ত; তার বেশী নয়।

তিনটি বারান্দাতে তিনটি বাড়ীর গৃহকর্তা তক্তাপোষের উপর শুয়ে থাকেন। সামনে থানা। এবং ভরা বাজারের একেবারে মধ্যস্থলে সদর রাস্তার উপর; সেই রাস্তায় ভোর তিনটে থেকে রাত্রি বারোটা একটা পর্যন্ত দশমিনিট পনের মিনিট অন্তর গরুর গাড়ী চলে; ওদিকে মুরশিদাবাদ ও বর্দ্ধমান জেলা থেকে এ দিকে তুমকা পর্যন্ত প্রসারিত রাস্তা; এদিক থেকে আসে মাষকালাই, ছোলা, মসুর, লঙ্কা, কুমড়ো, পেঁয়াজ, নানা রবি ফসল এবং এই অঞ্চলের ধান চাল এই পথ ধরে যায় আমদপুর পর্যন্ত; ওদিক থেকে মাল আসে নটকোণের, আমদপুর ষ্টেশনের, আর আসে তুমকা থেকে শালপাতা, শালের কাঠ, কাঠের তৈরী জিনিষ, গাড়ীর চাকা জানালা দরজা ইত্যাদি। সুতরাং বারোটা একটা থেকে তিনটে পর্যন্ত তিন চার ঘণ্টা রাস্তা জনহীন হয়। কিন্তু একশো ফুট দূরে সামনে থানা রয়েছে। সুতরাং চোর ডাকাতের ভয় আদৌ কেউ করত না। আর একটু আছে। লাভপুরে এর আগে গত দুশো তিনশো বছরের মধ্যে কখনও ডাকাতি হয়েছে বলে কেউ শোনে নি।

দুশো তিন শো কি তারও আগের একটি কাহিনী প্রবাদের মত প্রচলিত ছিল—তাও ভয়ের কথা নয়, ভরসার কথা। লাভপুরের একমুখে মা ফুল্লরা আছেন—তাঁর স্থান অতিক্রম করে একদল ডাকাত লাভপুর প্রবেশ করতে গিয়ে নাকি সকলেই অন্ধ হয়ে গিয়ে হাত জোড় করে বসেছিল।

এই পাশাপাশি তিনটি বাড়ী এবং বারান্দার পূর্ব দিকেরটির মালিক হল এক মোদক, মাঝেরটির মালিক—দত্ত, পশ্চিম দিকেরটির মালিকের হল এক প্রামাণিক—সেও জাতিতে গন্ধবণিক—দত্তের স্বজাতি এবং কুটুম্ব, দত্তের দৌহিত্রীর সঙ্গে প্রামাণিকের এক ছেলের বিয়ে হয়েছিল—ছেলের বয়স আট দশ কি বারো—মেয়ের বয়স তিন। মোদকের মিষ্টান্নের দোকান, পাড়াগাঁয়ে মিষ্টান্ন খুব বেশী কাটে না, কাটে মুড়ি মুড়কী পাটালী বাতাসা, পূজার্চনার জন্য মণ্ডা, এর উপর জিলিপী এবং রসগোল্লা, বাসী তেবাসী হয়ে দোকানে সাজানো থাকে।

মাঝের ওই দত্তের সামান্য নুন তেলের দোকান—সেটা গৌণ এবং নেহাৎ বসে থাকতে হবে, সময় কাটবে না ব'লে করা—নইলে দত্তের আসল কারবার গহনা বন্ধক রাখবার; মোটা সুদে, নির্দিষ্ট সময়ের ওয়াদা রেখে টাকা দেয়; সময়ের মধ্যে টাকা শোধ না হলে গহনা সে গালিয়ে দেয়। কারবার অনেক টাকার।

প্রামাণিকের দোকান নটকোণের। ঝাল মসলা নুন তেল—বেনেতীর দোকান।

খুন হ'ল এই মাঝের দোকানের মালিক—ওই দত্ত।

চীৎকার হল না, কেউ বিন্দু বিসর্গ জানতে পারলে না। থানা না, মোদক না, সকালে দেখা গেল আধখানা গলা কাটা অবস্থায় দত্ত বারান্দার তক্তাপোষ থেকে গড়িয়ে সদর রাস্তার উপর পড়ে আছে;

দেওয়ালে ফোয়ারার ধারার মত রক্তের ছিটে লেগেছে, পথের ধূলো জমাট বেঁধে রয়েছে।

গ্রামখানি চঞ্চল চকিত হয়ে উঠল। আমি সেদিন সকালবেলা বাড়ীর লোককে লুকিয়ে ছুটে গিয়েছিলাম এই খুন দেখতে। খুন—খুন—শব্দটা শুনেছিলাম। উচ্চারণের ভঙ্গিতে বর্ণনার ধারায় মনের মধ্যে একটা আতঙ্ক সৃষ্টি করত। সেই আতঙ্কের আকর্ষণেই সেদিন গিয়েছিলাম। জীব হত্যা এর আগে দেখেছি। পাঠা মহিষ মেষ কাটতে দেখেছি, ছিন্ন মস্তক জীবগুলির কবন্ধ নেড়েছি, রক্তের উষ্ণ স্পর্শ অনুভব করেছি। গুলি করে মারা পাখী কুকুর দেখেছি। কিন্তু ছিন্নকণ্ঠ মানুষ সেই প্রথম দেখলাম্। সে কি ভয়ঙ্কর! ভয়ঙ্করকে চোখে ক' জন দেখে? এমনই ভয়ঙ্কর দৃশ্যের মধ্যেই তার অদৃশ্য অস্তিত্ব অনুভব করে মানুষ। আমার সেদিন মনে হয়েছিল গভীর রাত্রের অন্ধকারের মধ্যে যারা হত্যা করেছিল বা যে হত্যা করেছিল তাদের মূর্তি কল্পনা করতে গিয়ে মনশ্চক্ষে ভয়ঙ্করকে দেখেছিলাম; দেখেছিলাম তাদের অবয়ব আকার মানুষের মত হলেও সেই অবয়ব ও আকার সর্বাঙ্গে—দৃষ্টিতে অধরোষ্ঠে ঈষৎ প্রকাশিত কয়েকটি দাঁতের ভঙ্গিমায়, তাদের হাতের মুঠির নিষ্ঠুর কাঠিন্যে—নিষ্ঠুরতায় হিংস্রতায় এমন একটি আতঙ্ককর আহুতি দান করেছে যে তার রূপ আর মানুষের রূপ নাই—সে রূপ মহাভয়ঙ্করের রূপ। কত রাত্রি যে ঘুমাতে পারিনি এই ঘটনার পর—তার হিসেব নাই। মনে হত যদি শিয়রে সে এসে নিঃশব্দে দাঁড়ায়। বনের মধ্যে গভীর রাত্রে মানুষের সামনে বাঘ বা ক্রুর নিমেষহীন দৃষ্টি অজগরের সঙ্গে তার ঘনিষ্ট মিল আছে। খাদ্যের লোভ এবং হিংসার সংগে আরও একটু কিছু আছে, যার পরিচয় পরিস্ফুট তার নিঃশব্দ পদক্ষেপে, অনুসরণে, অসতর্ক মুহূর্তের আক্রমণে; তার সঙ্গে এই হত্যাকারী মানুষের রাত্রের অন্ধকারে নিঃশব্দ

আক্রমণের সঙ্গে একটা সামঞ্জস্য আছে। সাধারণ ব্যাখ্যায় এটা আত্মরক্ষার বুদ্ধির প্রেরণা। ওই সন্ন্যাসী আমাকে যে কথা বলেছিলেন —সে অনুযায়ী এর ব্যাখ্যায় আরও কিছু আছে। বাঘ সাপের বেলা সেটা কিছু অপরিস্ফুট কিন্তু মানুষের বেলা সেটা পূর্ণ পরিস্ফুট। ওই অচেতন উন্মাদিনী শক্তি তার চৈতন্যময় আদিত্যবর্ণ জ্যোতির প্রকাশকে তমসায় স্তব্ধতায় উন্মত্ততায় আচ্ছন্ন অভিভূত করে দিয়েছে রাহুগ্রাসের মত।

উনিশ শো ছ সালের মে মাসে এই খুন হয়েছিল।

আজ উনিশ শো বায়ান্ন সাল। উনিশ শো বায়ান্ন সালের দশই সেপ্টেম্বর পূর্ণ ছেচল্লিশ বৎসর পর আর একটি খুন হয়েছে লাভপুরেরই প্রান্তভাগে।

এরই মধ্যে সেই বিচিত্র এবার মহাতামসী ভয়ঙ্করী রূপে প্রকটিত হলেন আমার দৃষ্টির সম্মুখে। আমি তাঁকে যেন আভাসে অনুভব করলাম—হয়তো গভীর রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে দিগন্তের কৃষ্ণ মেঘের মত চকিত হাস্যে বিস্ফুরিত দেখলাম। এবং দেখলাম—এই মহাতামসী—এই ছে চল্লিশ বৎসর ধরে একটি মানব বংশকে অনুসরণ করে আসছে—তাদের অন্তরলোকের মধ্যেই তাদের হীনবল ক্ষীণ-জ্যোতি আদিত্যবর্ণ পুরুষকে রাহুর মত গ্রাস করে আসছে।

তার আগে বলব এই দশই সেপ্টেম্বরের খুনের কথা।

এবার পরাভূত-চৈতন্য হত্যাকারী নিজেই স্বীকার করেছে পুলিশের কাছে ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে। একটি সতের আঠার বছরের কিশোর। ওই দত্তের পূর্বদিকের প্রতিবেশী মোদকের পৌত্র।

দুই

দীর্ঘ সাতচল্লিশ বৎসর কাল—অর্দ্ধশতাব্দী কাল মানুষের জীবনে কম কাল নয়। মানুষের আয়ু শতাব্দীর সীমারেখায় পূর্ণ হ'লে জীবনের অর্দ্ধেক। এ কালের মধ্যে মানুষের সাধনা সমাপ্ত হয়। এক পুরুষ থেকে তৃতীয় পুরুষের পর্যায়ে নূতন সাধনা সুরু হয়। মাঝখানের পুরুষের সাধনার ফলে—পূর্বপুরুষ ও উত্তমপুরুষের জীবন ধারায়, সাধনার পন্থায় অনেক পার্থক্যের সৃষ্টি করে। কিন্তু আদিশক্তি তামসীরূপ ধারণ করবার হেতু পায় যে রক্তধারার মধ্যে সেখানে সে ভয়ঙ্করী আপনাকে পরিপূর্ণ রূপে প্রকট করে মানব-জীবনের সকল জ্যোতি সকল বিভূতিটুকু গ্রাস না করা পর্যন্ত শান্ত হয় না—ক্ষান্ত হয় না। এদিক দিয়ে সে ক্ষমাহীনা, সে অমোঘা। কদাচিৎ কোন বংশের রক্তে পূর্বকালের মহাপুণ্য সঞ্চিত থাকলে তাকে স্থির শান্ত হ'তে হয়। এক পুরুষের আকস্মিক কোন কর্মে মহাতমসা জাগ্রত হলেও পূর্বপুরুষের সেই মহাপুণ্য পরপুরুষকে রক্ষা করে। মহাতমসা তাকে গ্রাস না করে তাকে নিষ্কৃতি দেয়।

দত্তের হত্যায় যে ভয়ঙ্করী মহাতামসী জাগ্রত হয়েছিল সে-ই আমার দৃঢ় ধারণা—সেই আঠার বছরের একটি কিশোরকে উন্মত্ত ক'রে তুললে। সে কিশোর, মোদকের পৌত্র। এবং ওই মোদকের পরিবারে দত্তের হত্যার পর বহু বিপর্যয় ঘটেছিল। সে কথা পরে আসবে। শুধু একটি কথা বলব—মোদক এরপর বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত হয়েছিল। জন্মগত জাতি পরিত্যাগ ক'রে বৈষ্ণব সাম্প্রদায়িক রীতি-পদ্ধতি অনুযায়ী জীবে দয়া নামে প্রেমকেই করে তুলতে চেয়েছিল জীবনের তপস্যা। বলতে পারি না—তবু মনে হয়, সে বোধ হয় এর প্রয়োজন অনুভব করেছিল—মহাতামসীর

আভাস সে যেন অনুভব করেছিল সূর্যাস্তকালে প্রান্তরচারী একক পথিকের মত। অনুভব করেছিল—তাকে কেন্দ্রে রেখে বৃত্তাকারে নেমে আসছে রাত্রির অন্ধকারের মত ওই মহাতামসী। তাই সে নিয়েছিল এই মন্ত্র, এই দীক্ষা। মোদকের ছোটছেলে মাধু। মাধুও বৈষ্ণব। তার জীবনে ওই দ্বন্দ্ব। একদিকে জ্যোতির সাধনা—অন্যদিকে তমসার আক্রমণ। এমন সুস্পষ্ট সুপরিস্ফুট দ্বন্দ্ব দেখা যায় না। মাধুর জীবনের এই দ্বন্দ্ব আমাকে গভীর ভাবে আকৃষ্ট করেছিল। তাকে নিয়ে লিখেছি 'তামস তপস্যা' উপন্যাস। তামস তপস্যার শেষটা ছিল কল্পনা। মানুষ যা চায়—যে পরিণাম কাম্য কল্যাণকর তাই কল্পনা করে আমিও তাই করেছিলাম। ভাবতে পারিনি অনিবার্য মহাপরিণাম। গত দশই সেপ্টেম্বর সেই পরিণাম ঘটল।

ওই মোদকের ছোট ছেলে মাধু বৈষ্ণব—তার ছেলে দুলাল দাস অর্থাৎ বৈষ্ণব। নিকষের মত কালো কিন্তু সে কালো রঙে আছে যেন এক প্রসন্ন লাবণ্য; পাতলা ছিপছিপে শরীর—সরল তেজালো কচি বাঁশের মত লম্বাটে; ষোল সতের বছর বয়স—দুর্লভ মুখশ্রী এবং দেহশ্রী। ছোট কপাল আয়ত চোখ, বাঁশীর মত নাক, পাতলা দুটি ঠোঁট, সুন্দর সুগঠিত দাঁতের সারি, এমন সুন্দর কালো মানুষ কদাচিত চোখে পড়ে। শুধু তাই নয়—ওই কালো ছেলেটির কণ্ঠস্বর সুন্দর, প্রসন্ন, মিষ্ট—কাজকর্ম সুন্দর—পরিচ্ছন্ন নিখুঁত—সবচেয়ে সুন্দর ছিল হাসি এবং বিষণ্ণতা; হাসলে বড় ভাল লাগত, তিরস্কারে বিষণ্ণ হ'ত, এক মুহূর্তে যেন কচি লতার ছেঁড়া ডগার মত ভেঙে পড়ত, তিরস্কারকারীর মনও বিষণ্ণতায় আচ্ছন্ন হয়ে যেত। আবার ডেকে একটি স্নেহের কথা বললেই সে হেসে উজ্জ্বল হয়ে উঠত।

এই দুলাল দাস; সেই মোদকের পৌত্র—মাধুর ছোট ছেলে। বছর খানেক আগে সে এল আমার কলকাতার বাড়ীতে। চাকরী করবে। বাপের সঙ্গে ঝগড়া করেছে। মাধুর বিয়ে তিনটি কি চারটি। দুলালের মা নেই। তার মায়ের মৃত্যুর পর মাধু অনেকদিন বিয়ে করে নি, দুলালই ছিল আনন্দ দুলাল; আগেকার স্ত্রীপুত্রদের পৃথক করে দিয়ে দুলালকে নিয়েই ঘর বেঁধেছিল স্বতন্ত্রভাবে। তারপর আবার মাধু হঠাৎ বিয়ে ক'রে বসেছে। দুলালের বয়স তখন বছর বারো। এখন দুলালের বয়স ষোল। এখন আর নন্দর সঙ্গে বাপ মায়ের বনছে না। বাপ দুর্দান্ত ক্রোধী। সে ক্রোধ আমার ধারণায় সেই মহাতমসারই ভ্রূকুটি। দুলালেরও দুরন্ত ক্ষোভ। সেই ক্ষোভে সে ঘর ছেড়ে চলে এসেছে। মাধু অবিচার করেনি, সে তার সম্পত্তি বাড়ী-ঘর ছেলেদের সঙ্গে সমান ভাগে ভাগ করে—ছেলেদের এক এক ভাগ দিয়ে নিজে একভাগ মাত্র নিয়েই নূতন স্ত্রীর সঙ্গে ঘর বেঁধেছে স্বতন্ত্র ভাবে। বিক্ষুব্ধ দুলাল সে সম্পত্তি, সে ঘর ফেলেই চলে এসেছে। দুলালের বিয়েও দিয়ে দিয়েছে। বউ অবশ্য আট ন বছরের, সে বাপের বাড়ীতেই থাকে, ছেলেটা সেখানেও যায় নি। সে খেটে খাবে, নিজের পায়ে দাঁড়াবে।

চাকরী করতে করতেই সে একদিন বললে—আমি মোটর চালানো শিখব, ড্রাইভার হব যদি—। যদি আমার বাড়ী থেকে সে একবেলা ক'রে ছুটি পায়। পুরো একবেলা নয় অবশ্য, দিনে ঘণ্টা চারেক ছুটি। খাওয়া দাওয়ার পর—দুটো থেকে ছটা।

আমি খুসী হয়ে মত দিলাম। বেশ তো—তাই যাবি।

আমার কাছেই তার মাইনের টাকা জমা ছিল—বোধ করি এক শো কত টাকা, সে টাকাটা চাইলে—যে গ্যারেজে ড্রাইভিং শিখবে তাদের লাগবে। তাও নিয়ে গেল। কাজ শিখতে লাগল।

মাস তিনেক পর হঠাৎ আমার গ্যারেজে চুরি হল। আমার ড্রাইভার, সেও আমার দেশের লোক, ওই দুলালের মতই এসেছিল চাকরের কাজ নিয়ে—তারপর ড্রাইভিং শিখেছে; সে তখন ছুটিতে ছিল দেশে; একজন অস্থায়ী লোক কাজ করছিল তখন। চুরিটা হল আমার স্থায়ী ড্রাইভার ফিরে আসবার দিন তিনেক আগে। তারপর ড্রাইভার ফিরল এবং মাস দেড়েক পর আবার চুরি হ'ল। এবং মধ্যে মধ্যে এটা ওটা হারাতে লাগল। একটু আধটু কল বেগড়াতে সুরু হ'ল। এবার আমার ড্রাইভার দুলালকে ধরলে। চুরির মধ্যে সে আছে এবং গাড়ীর কল বেগড়ায় তারই নাড়াচাড়ায়। সে ড্রাইভিং শিখছে; সে-ই স্বাভাবিক ভাবে নাড়েচাড়ে। এবং ঠিকমত নাড়াচাড়া না-হয়ে বেঠিক হলেই কল মাথা নাড়া দিয়ে বিগড়ে বসে।

এই নিয়েই আমি তাকে জবাব দিলাম। যা মাইনে বাকী ছিল মিটিয়ে দিয়ে বললাম—তুমি অন্যত্র যাও। এখানে আর রাখতে পারব না।

ছেলেটা বিষণ্ণ হয়ে চলে গেল। বেরিয়ে গেল বাড়ী থেকে। ফিরল সন্ধ্যাবেলা, অস্নাত, অভুক্ত। বিষণ্ণতায়, অনাহারে, শেষ শ্রাবণ কি প্রথম ভাদ্রের রৌদ্রে ধুলায় যেন শুকিয়ে গেছে। সন্ধ্যায় স্নান করে খেলে, তারপর শুয়ে পড়ল। পরদিনও ঠিক তাই। তৃতীয় দিনে আবার তাকে ডেকে বললাম—বেশ, যেমন কাজ করছিলে কাজ কর। খুসী হয়ে উঠল।

এর ঠিক দিন কুড়ি পর আবার একদিন গাড়ী বেগড়াল। সেদিন আর বাড়ীতে ড্রাইভারের হাতে সোজা হল না। পরদিন গাড়ী গ্যারেজে গেল। ড্রাইভার গাড়ী নিয়ে ফিরে এসে বললে—দুলালেরই কাজ এটা। ও থাকলে গাড়ী ঠিক রাখতে পারব না আমি।

ছেলেটা চুপ করেই দাঁড়িয়ে রইল।

আমিও কিছু স্থির করতে পারলাম না। ছেলেটার উপর অবিশ্বাস আমি যেন কিছুতেই করতে পারছিলাম না। আমার সন্দেহ হচ্ছিল—এ সবের সঙ্গে দুলালের সংশ্রব ছিল না। হয় তো ড্রাইভারের অহেতুক সন্দেহ। হয় তো দুলাল ড্রাইভার হয়ে উঠলে তার সমকক্ষ হয়ে উঠবে—এমন কি তার স্থানও অধিকার করে নিতে পারে। অবচেতন মনের এমনই ঈর্ষা ও আশঙ্কার তাড়নায় সে নিজে সন্দেহ করে আমাকেও সন্দেহ করাতে চেয়েছিল। সেদিনও এ কথাটা আমার মনে হয়েছিল—তাই চুপ করেই ছিলাম। পরদিন সকালে ১০ই সেপ্টেম্বর আমি কাজ করছি—হয় তো বা 'বিচিত্র' পর্যায়ের লেখাই লিখছি—হঠাৎ কানে এল মারপিটের শব্দ এবং আমার স্ত্রীর সতর্ক কণ্ঠস্বর ;—এ কি করছ? এ কি? ছাড়—ছাড়! দুলাল, করালী! আমি উঠে গেলাম। দেখলাম দুলাল আর করালী (ড্রাইভার) যে ঘরে থাকে সেই ঘরে একদিকে ক্রুদ্ধ করালী দাঁড়িয়ে রয়েছে, অন্যদিকে দুলাল বসে কাঁদছে। আমার এখনও স্পষ্ট চোখে ভাসছে—তার আয়ত সুন্দর চোখ দুটি জলে ভরে ভরে উঠছে এবং সে দুটি ঈষৎ রক্তাভ। আমার সামনেই সে জল চোখের কিনারা ছাপিয়ে মুখের উপর দিয়ে গড়িয়ে এসে মেঝের উপর ঝরে পড়ল। ঝরতেই থাকল। গলায় একটা ক্ষত চিহ্ন। করালীর হাতের নখে চিরে গিয়েছে।

শুনলাম দুলাল গাড়ী পরিষ্কারের কাজ করতে অস্বীকার করায় ঝগড়া হয়েছে। সে বলেছে—গাড়ী খারাপ ক'রে দেওয়ার অপবাদ নিতে হচ্ছে যেখানে সেখানে ও কাজ কিছুতেই আমি করব না। এবং এই নিয়ে কথান্তরের মধ্যে ছেলেটা হঠাৎ বলেছে—তোমাকে আমি খুন করে দেব একদিন!

করালী বলিষ্ঠ; করালী সাহসী; দুঃসাহসী। সে সহ্য করবে কেন? সে চড় মেরেছে। দুলালও আঘাত করতে গেছে কিন্তু পারে নি। করালী তার গলা টিপে ধরেছিল। সেই মুহূর্তেই আমার স্ত্রী গিয়ে পড়েছিলেন—সেই কারণেই আর অগ্রসর হতে পারে নি এ দ্বন্দ্ব।

আমার ওই কথাটাই খারাপ লাগল—খুন করে দেব!

আমি ছেলেটাকে বললাম—তোমাকে জবাব দিলাম আমি। কুড়ি দিনের মাইনেও দিয়ে দিলাম। বললাম—তুমি চলে যাবে আজই। নইলে, তুমি যে না খেয়ে দেয়ে ঘুরে ফিরে আসবে—পড়ে থাকবে, আমাকে একটা কঠিন বিচারের মধ্যে ফেলবে, সে হবে না। চলে যাবে আজই। এবং স্নান ক'রে খেয়ে তবে যাবে।

ছেলেটা আমার মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল।

চোখের জল তখন শুকিয়ে এসেছে। তারপর হঠাৎ উঠল—উঠে বেরিয়ে গেল। আমি প্রশ্ন করলাম—কোথায় যাচ্ছিস?

—আসছি। মৃদু অনুদ্ধত স্বরেই সে বললে। মাথা হেঁট করে বেরিয়ে গেল।

আমার নিজের সেদিন কিছু কাজ ছিল সরকারী দপ্তরখানায়। আমার স্নান-আহারের সময় সাধারণতঃ একটা থেকে দেড়টা। সে দিন ওই কাজের জন্যেই এগারটায় স্নান করে খেতে বসলাম। আমার বাড়ীর খাওয়াদাওয়ার মধ্যে কোন ভেদাভেদ নেই; ঠাকুর-চাকর থেকে বাড়ীর লোক এক সঙ্গে একই ঘরে বসে খাওয়ার নিয়ম। আমার সঙ্গেই এক দিকে দুলাল এবং করালী খেতে বসল। খাওয়া শেষ করে কাপড় জামা প'রে নিচে নেমে এলাম—ঠিক সেই মুহূর্তেই দুলাল বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল, পরিষ্কার একখানি ধুতি, একটি পরিষ্কার নীল ষ্ট্রাইপ দেওয়া শার্ট—পায়ে স্যাণ্ডেল এবং কাঁধে একটা হাল আমলের ঝুলি ঝুলিয়ে নিঃশব্দে কিন্তু একটুও ত্বরিত গতিতেই

বেরিয়ে চলে গেল। হাতে তার স্যুটকেশ বা বাক্স ছিল না। আমি ভাবলাম বোধ হয় কাছের দোকানে গেল। হয়তো কাজ আছে। বিড়ি কিনবে বা ধার মেটাবে। কি কিছু।

বাড়ী ফিরলাম অপরাহ্নে।

কি কাজে বিস্মৃতি বশতঃ দুলালকেই খুঁজলাম। সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়ল, দুলালকে জবাব দিয়েছি। মনটা বিষণ্ণ হল। তবুও জিজ্ঞাসা করলাম—দুলাল চলে গেছে?

ঠাকুর বললে—না। জিনিষপত্র রয়েছে। সে গিয়েছে তার দাদার কাছে, কাল এসে জিনিষপত্র নিয়ে চলে যাবে।

দুলালের বৈমাত্রের দাদা পুলিশে চাকরী করে। টালিগঞ্জ থানায় কনেষ্টবল। দুলাল সেখানে গেছে। মনে হল আশ্রয় খুঁজতে গেছে। তার ড্রাইভারি লাইসেন্স পেতে আর বেশী দেরী হবে না, মাস দুয়েক কি মাসখানেকের মধ্যেই লাইসেন্স পাবে; এই সময়টা থাকবার জন্যই সে তার দাদার কাছে গেছে। তার বৈমাত্রের দাদা তার থেকে বছর দুয়েকের হয়তো বড়, তার বেশী নয় এবং দুলালের সঙ্গে তার প্রীতির সম্পর্কও আছে। মধ্যে মধ্যে আমার বাড়ীতে আসত ভাইকে দেখতে; দুই ভাইয়ে প্রসন্ন হাস্যের সঙ্গে গল্পও করত। কখনও কখনও টেলিফোনেও ভাইকে ডাকত। কথা বলত।...আবার আমার মনটা বিষণ্ণ হল। দুটো মাসের জন্যে ছেলেটাকে আশ্রয়চ্যুত করা উচিত হয় নি। খুন করব বললেই খুন করে না মানুষ। খুন করতে যে নিষ্ঠুরতার প্রয়োজন তেমনি নিষ্ঠুর তো মানুষ নয়! যে উন্মত্ততায় আচ্ছন্ন হলে মানুষ সেই আদিম জান্তব বা পাশব আক্রোশ ফিরে পেতে পারে—সে উন্মত্ততা তো সহজে আসে না!

ছেলেটার কিন্তু তাই এসেছিল। সে স্বীকার করেছে পুলিশের কাছে আদালতে—তা-ই তার এসেছিল। ওই টুকুতেই এসেছিল।

তারই স্বীকার করা উক্তি শুনে সেই ঘটনাই বলছি। আর বুঝতে চেষ্টা করছি—কি ভাবে কেমন করে হল! ওই একটি নমনীয় দেহ কমনীয় কান্তি কিশোর—এমন ভয়ঙ্কর সে হ'ল কি করে? ভাবছি আর মনে হচ্ছে মহাতামসীর কাণ্ড।

মহাতামসীর সৃষ্টিগ্রাসী ক্ষুধা! সৃষ্টিকে গ্রাস করেই সে অন্ধ বধির; নিরন্ধ্র নিশ্ছিদ্র মহাতামসী। সে যার মধ্যে বা যে বংশের রক্ত ধারার মধ্যে কেবল মাত্র প্রবৃত্তির তাড়নায় জাগে তার মধ্যে সে আশ্রয় নেয়, তার দেহে মনে সর্বাঙ্গে, দেহের কোষে কোষে নিজেকে বিস্তার করে রাখে। চৈতন্য-সাধনারত মানুষের সমাজের প্রতিক্রিয়াতে তামসীর আসন হয় দৃঢ়। এইখানেই তান্ত্রিকের তন্ত্রসাধনায় এই মহাশক্তির পূজার প্রভেদ। তান্ত্রিক নিজের চৈতন্তকে প্রবুদ্ধ ক'রে সজাগ রেখে নিজের বক্ষরক্তে পূজা দিয়ে মহাশক্তিকে মহাচৈতন্ত চৈতন্তময়ী করে তোলে। বহু সহস্র বৎসর ধরে সমষ্টিগত সাধনায় মানুষ যে চৈতন্যে যে অনুভূতিতে যে বিভূতিতে উপনীত হতে পারবে—সেই চৈতন্য সেই অনুভূতি সেই বিভূতিতে সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতি তার কাছে আনন্দময়ী হয়ে ওঠে। আর সাধারণ অসহায় মানুষ, তার কোষে কোষে বিস্তৃত এই তামসী—সামান্ততম অন্তর-প্রকৃতির বিপর্যয়ে ক্রোধে ক্ষোভে দুঃখে হিংসায় লালসায়—যাতেই হোক, অন্তর প্রকৃতিতে বিপর্যয় ঘটলেই কালো কুয়াশার মত জেগে উঠতে থাকে—আচ্ছন্ন ক'রে দেয় চৈতন্তকে এবং সর্বশেষ চেতনাকে পর্যন্ত। তখন থাকে শুধু ক্রোধ ক্ষোভ লালসা বা হিংসা। সে তখন অন্ধ—সে তখন বধির।

দুলালের কোষে কোষে বিস্তৃত সেই তামসী সেদিনের ওই ক্রোধে এবং ক্ষোভে সম্ভবত অকস্মাৎ জেগে উঠেছিল। করালী তাকে গলায় টিপে ধরেছিল—সে তাকে চড় মেরেছিল, তার জন্য ক্রোধ।

এবং আমি তাকে জবাব দিয়েছিলাম—আমার উপর তার বিশ্বাস ছিল, আমাকে সে আশ্রয় করতে চেয়েছিল; আমি তাকে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছি, তার বিশ্বাসের প্রতিদানে হতাশ্বাস করেছি তার জন্য ক্ষোভ!

দুলাল যে কেমন ভাবে, কেমন চেহারা কেমন দৃষ্টি নিয়ে বেরিয়েছিল—সেটা লক্ষ্য করিনি তাই আপশোষ হয়। মনে হয় আচ্ছন্নের মত দৃষ্টি নিয়ে নীরব স্তব্ধ ভাবে সুদীর্ঘ পথটা অতিক্রম করেছিল। সুদীর্ঘ পথ—একশো আঠারো মাইল। টালিগঞ্জ সে যায় নি। সে এখান থেকে হাওড়ায় ট্রেণ ধরে গিয়েছিল লাভপুর। সন্ধ্যে সাতটা বা সাড়ে সাতটা তখন। ১০ই সেপ্টেম্বর, সেদিন ছিল আকাশে ঘন মেঘ—সে মেঘে ছিল বর্ষণ। তার সঙ্গে ছিল বর্ষার বড়ো এলোমেলো বাতাস। সাইক্লোনিক আবহাওয়া। সে তাই বলেছে। দুলালের স্বীকারোক্তি।

বাঁকা তীক্ষ্ণ ফোটায় বৃষ্টি।

বাতাসে গাছের মাথায় মাথায় আছড়া আছড়ি চলছে। সোঁ সোঁ শব্দ উঠছে।

এরই মধ্যে দুলাল নেমে নির্জন রেললাইনের পথ ধরে চলেছিল। তার আচ্ছন্ন মস্তিষ্কের মধ্যে ক্রোধ, ক্ষোভ, আর আছে সেই আদিম কালের আরণ্য চাতুর্য, আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি এবং ভয় থেকে তার উদ্ভব। সবই মহাতামসীর ইঙ্গিত—তারই চালনা। নন্দ শুধু চলেই ছিল। অসহায়, আচ্ছন্ন, মায়ামমতা স্নেহ ভালবাসা প্রেম সব জমে প্রস্তরীভূত হয়ে আসছে। বোবা হয়ে গেছে।

ছেলেটা বলেছে, সেই ঝড়ো হাওয়া আর বর্ষণের মধ্যে সে এসে থমকে দাঁড়িয়েছিল তার বাপের বাড়ীর পাশে।

তিন

গ্রামের একপ্রান্তে মাধু বৈষ্ণবের ঘর এবং দোকান। মাধু—সেই মোদকের ছেলে। সেও এই মহাতামসীর আক্রমণে আক্রান্ত—সে সমাজ চায় নি। সহায় চায় নি। পৃথিবীর কাউকে ভয় করেনি, চোরকে না—ডাকাতকে না, সাপকে না, মৃত্যুকেই তার ভয় ছিল না; মানুষকে হত্যা করতেও তার অপ্রবৃত্তি ছিল না, শুধু দণ্ডকে ভয় করত বলেই করেনি। তাও ভোগকে ভালবাসত বলেই মৃত্যুদণ্ডকে ভয় করত। গ্রামের প্রান্তে, বসতি থেকে দূরে প্রান্তরের মধ্যে তার বাড়ী। বাড়ীর পাশে একটা পুকুর। বহুকালের প্রাচীন মজা একটা পুকুর—মাধুই তার পঙ্কোদ্ধার ক'রে চারিপাশে বাগান লাগিয়েছে। সেই বাগান এখন একটি ঘন জমাট ছায়ার রাজত্ব। থম থম করছে অন্ধকার। দুলাল বলেছে, সে তারই ভিতর গিয়ে গাঢ়তম অন্ধকার ঠাঁইটিতে স্তব্ধ নিস্পন্দ সেই প্রগাঢ় অন্ধকারের মধ্যে বসে আছে। যেন মিশে গিয়েছে। ভিতরের মহাতামসীর ছায়া পড়েছে বহির্লোকে—সেই লোকে দুলাল বসে আছে সমুদ্র তলের হিংস্র শ্বাপদের মত। মধ্যে মধ্যে ফস ক'রে দেশলাই জ্বালিয়ে বিড়ি ধরিয়েছে—টেনেছে। কিন্তু প্রতিবারেই চকিত হয়ে হয়ে উঠেছে ওই নিজের জ্বালা দেশলাইয়ের কাঠির শিখার ছটায়। ত্রস্ত হয়ে ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে দিয়েছে। বিরক্ত হয়েছে। হবেই যে! আলোর ছটায় শুধু ধরা পড়ার ভয়ই নয়—ওর মধ্যে চৈতন্যেরও আহ্বান আছে। বাহিরের আলোর ছটায় ভিতরে আলো জ্বলতে চেয়েছে। মহাতামসী ভ্রুকুটি করেছে। ত্বরিত ফুৎকারে আলো নিবিয়ে শান্তি পেয়েছে সে।

হঠাৎ ডাকল পেঁচা। ওদিকে প্রান্তরে প্রান্তরে উঠল শিবারব। প্রহর ঘোষণা করে গেল।

দুলাল বোধ হয় তখন একবার চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। তারপর আবার স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল।

ঝিঁ-ঝিঁ ডাকছিল। বাতাস তুলছিল গাছে গাছে শব্দ।

সরীসৃপও নিশ্চয় সঞ্চরণ করছিল। দুলাল ঈষৎ বক্র দৃষ্টিতে স্থির হয়ে তাকিয়েছিল। হয়তো তার সুন্দর দাঁতগুলি কুটিল আক্রোশে নিঃশব্দে বিকশিত হয়েছিল বারবার।

পুলিশের কাছে এবং নিচের আদালতে সে বর্ণনা করেছে সে দিনের কথা। বর্ণনা করেছে যা ঘটেছিল সেইটুকু। কিন্তু যে বা যা তার সমস্ত চৈতন্যকে আচ্ছন্ন করে অসহায়ের মত অথবা উন্মত্তের মত তাকে দিয়ে এই ঘটনা ঘটিয়েছিল তাকে সে অনুভব করতে পারে নি, সেই উন্মত্ত অবস্থার ভয়াবহতার স্মৃতি তার কাছে আজ ঝাপসা, হয়তো বা সে স্মরণ করতেই পারে না বা পারবে না। যিনি ক্রোধ রূপে সর্বভূতের মধ্যে বিরাজমানা—যিনি ভ্রান্তি রূপে সর্বভূতের মধ্যে বিরাজমানা—তিনিই কালরাত্রি, তিনিই মহাতামসী। মহাক্রোধ বা নিদারুণ ভ্রান্তি রূপের মধ্যেও সেই মহাশক্তি বলে তাকে যে চিনতে বা অনুভব করতে পারে—তার অন্তরে মহাতামসী সেই মুহূর্তেই চৈতন্যময়ী হয়ে ওঠেন। সেই মুহূর্তেই সে লীলা উপলব্ধি করে ধন্য হয় এবং মহাশক্তিকে প্রণাম করে বলে—

যা দেবী সর্বভূতেষু ভ্রান্তিরূপেন সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমোঃ ॥

তখন সে নিষ্কৃতি পায়।

নিতান্ত হতভাগ্য! সতেরো আঠারো বছরের কিশোর। তার উপর জীবনের আলোক সাধনা পুরুষানুক্রমে মহাতামসীর প্রভাবে ক্ষয়িত অপচয়িত; প্রায়ান্ধ মানুষের মতই তার অবস্থা; সে আলো চেনে না তাই অন্ধকারের রূপও জানে না। সে

চিনবে কি করে এই তামসীকে? যে অন্ধ সে অন্ধকারের প্রচণ্ডতাকেই বা বুঝবে কি করে? অমাবস্যার অন্ধকার ঘোর মেঘাচ্ছন্নতায় সূচীভেদ্য হলেই বা তার কি? সেই আচ্ছন্নতায় সে তখন আচ্ছন্ন।

সে নাকি গভীর রাত্রে সেই জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসেছিল।

আকাশে মেঘ ছিল, গাঢ় অন্ধকার চারিদিকে। সে এসে তার বাপের বাড়ীর দরজাটা বল্লমের ডগা দিয়ে ছাড়াতে সুরু করে। সে যে ঘটনা স্বীকার করেছে—তা সত্য হলে তখন তার রক্তের মধ্যে প্রতি কণায় কণায় রক্তবীজের বিনাশ কালে চামুণ্ডার জিহ্বায় যে রক্ততৃষ্ণা জেগেছিল—সেই রক্ততৃষ্ণা জেগেছিল; হয়তো বা সেই ভয়ঙ্করী রূপের ছায়া তার বাহ্য অবয়বের মধ্যে ফুটে উঠেছিল। দৃষ্টিতে নিষ্ঠুর ক্রোধ, দেহের প্রতিটি পেশীতে অমানুষিক কাঠিন্য। চামুণ্ডার 'শুষ্ক মাংসাতি ভৈরবা' রূপের প্রতিফলন তার সর্বাঙ্গে। বিখ্যাত গ্রন্থ ডাঃ জেকিল এণ্ড হাইডের ডাঃ জেকিল যে নিষ্ঠুর যন্ত্রণা অনুভব করতো সেই বিচিত্র বিষ পান করে—সেই যন্ত্রণা পার হয়ে সে যে হা হা শব্দ করত—সেই শব্দ তার সঘন শ্বাসপ্রশ্বাসের।

বাপের ঘুম ভেঙে গিয়েছিল ও শব্দে। নিচে ওই শব্দ কিসের? চোর! এবং শব্দের ধারা অনুসরণ করে তার অনুমান করতে ভুল হয়নি যে চোরই, ডাকাত নয়; চোর একজন বা দুজন, বড় জোর তিন জন থাকে। তারা ক্ষীণবল—ভীরু। মানুষের সাড়া পেলেই তারা পালায়। বাপ তার বাল্যকাল থেকে বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে বহুবার ভয়ঙ্করের সঙ্গে মুখোমুখী দাঁড়িয়েছে। দুর্দান্ত সাহস তার বুকে; প্রচণ্ড শক্তি তার দেহে। সে সারা জীবন ধরে নিষ্ঠুর আক্রোশে ক্রুদ্ধ এবং হিংস্র। মুহূর্তে সে মাথার শিয়রের লণ্ঠনের

শিখাটা বাড়িয়ে দিয়ে নেমে চলে এল। তার এই ঘরেই একবার ডাকাত পড়ার কথা আগে বলেছি। সে ডাকাতদের দরজা ভাঙার শব্দ পেয়েই হাতে একখানা হাঁসুয়া নিয়ে বেরিয়ে এসে লড়াই দিয়েছিল। সে লড়াইয়ে সে জিতেছিল। জীবনে হাঁসুয়া তার পরম প্রিয় সঙ্গী। দিনের বেলা বাইরে চালের কাঠে গোঁজা থাকে; রাত্রে থাকে মাথার শিয়রে বালিশের তলায়। কিন্তু ওই দিন কি কারণে জানি না, সে কারণের কথা বেঁচে থাকলে সে বলতে পারত, সে খালি হাতে নিচে নেমে এসেছিল। মাথার কাছে হাঁসুয়া খানা ছিল না? কোন কারণে অকেজো হয়েছিল? খুঁজে পায় নি? অথবা সামান্য একটা কি দুটো ছিঁচকে চোরের সম্মুখীন হতে তার মত শক্তিশালী শক্তিগর্বীর অস্ত্রের প্রয়োজন হয় না ভেবেই সে উপেক্ষা ভরে হাঁসুয়া নিয়ে আসে নি কে জানে? জানত সে।

স্বীকৃতির মধ্যে ছেলেটা বলেছে যে, তখন সে দরজার পাল্লা দুটোর মুখের তক্তা খানাকে নাকি ছাড়িয়ে—সেই ফাঁক দিয়ে একখানা হাত ঢুকিয়ে খিলটা খুলবার চেষ্টা করছিল। সেই মুহূর্তে বাপ এসে চেপে ধরেছিল তার হাত খানা। বাপের শক্তির কাছে এই কিশোর ছেলেটার শক্তি নগণ্য। তবু কিন্তু ছেলেটা মুহূর্তে হাতখানা ঝাঁকি দিয়ে ছাড়িয়ে নিয়েছিল। বাপের অসাবধানতা? তার প্রৌঢ়ত্বের শিথিলতা তরুণ ক্ষিপ্রকারিতার কাছে হার মেনেছিল? অথবা আত্মিক নিয়মে বাপ তার হাতখানা দৃঢ়বলে ধরবার আগেই টেনে নিয়েছিল কে জানে? শুধু তাই নয়, মহাতামসীর তমসাচ্ছন্নতায় অন্ধ উন্মত্ত ছেলেটা মুহূর্তের মধ্যে ওই দরজার ফাঁক দিয়ে হাতের বল্লমটা বাপের পেটে আমূল বিদ্ধ করে দিয়েই টেনে বের করে নিলে। বল্লমের ফলায় আটকে সেই টানে বেরিয়ে এল পেটের অন্ত্র।

বোধ করি বাপ সেই মুহূর্তে মৃত্যুর ছায়া দেখেছিল। ওই দরজার ফাঁক দিয়ে আততায়ীকে দেখেছিল মৃত্যু মূর্তিতে। সে বিহ্বল হয়েই ছুটে গিয়েছিল উপরে। সর্বাগ্রে কোন একটা কিছু দিয়ে তার পেটের ক্ষতটাকে বাঁধতে চেয়েছিল। ওই বল্লমের আঘাতে দীর্ণ পেটের ক্ষত মুখে অন্ত্রগুলি না কি বেরিয়ে আসছিল ক্রমশ। উপরে গিয়ে একখানা মশারী টেনে নিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে তার স্ত্রীকে বলেছিল—বাঁধ তো, দে তো বেঁধে।

ইতিমধ্যে উন্মত্তের মত এসে হাজির হয়েছিল তমসাচ্ছন্ন উন্মত্ত ছেলেটা। তামসী তখন বলি চায়। রক্তের স্বাদ তখন সে পেয়েছে।

প্রথমেই আক্রমণ করেছিল নাকি বিমাতাকে।

বিমাতা হাত জোড় ক'রে ক্ষমা চেয়েছিল—জীবন ভিক্ষা চেয়েছিল। কিন্তু দেবে কে? মহাতামসী ক্ষমাহীনা।

আঘাতের পর আঘাত। আঘাতের পর আঘাত। ছাব্বিশটা আঘাত। হাতে, মাথায়, মুখে, পিঠে, বুকে, ঊর্দ্ধাঙ্গের সবত্র। বছর খানেক বয়সের একটি মেয়ে না কি—আতঙ্কে বিহ্বল হয়ে মাকে জড়িয়ে ধরতে এসেছিল। নিষ্ঠুর ভোজালীর আঘাতে তার একখানা হাত কেটে ঝুলে গেল। মুহূর্তে শিশু হতচৈতন্য হয়ে গেল পড়ে। বিমাতাও মাটিতে লুটিয়ে পড়ে গেল। মৃত ভেবেই সে তাকে ছেড়ে দিয়ে পড়েছিল বাপের উপর। বহুপ্রচণ্ডতার দুর্দান্ত নায়ক—তামস-তপস্যার তপস্বীর জীবনাবসান হয়ে গেল অস্ত্রাঘাতে রক্তপাতে। গলাখানাকে কুপিয়ে কুপিয়ে প্রায় দ্বিখণ্ডিত করে দিয়েছিল।

তারপর রক্তাক্ত কলেবরে নেমে এসেছিল।

বোধ করি থর থর করে কাঁপছিল সে তখন—উন্মত্ত তামসী তখন তার দেহের কোষে কোষে নর্তনশীলা। সে চরণপাতে কাঁপবে বই কি দেহ। বোধ করি সেই কম্পমানতার মধ্যে দেহের ভারসাম্য

রাখবার জন্যেই একখানা রক্তাক্ত হাত দিয়ে দেওয়ালটাকে আশ্রয় করতে চেয়েছিল। রক্তাক্ত হাতের ছাপের মধ্যে থেকে গেল তার পরিচয়। এও বোধ করি মহাপ্রকৃতির নির্দেশ!

তারপর।

স্বীকার করেছে ছেলেটা যে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে স্নান ক'রে রক্তাক্ত জামা কাপড ছেড়ে ভোজালী বল্লম টর্চ জামা কাপড় গেঞ্জি পুকুরের মধ্যে পাথর বা ইঁট চাপা দিয়ে রেখে সেখান থেকে আবার রওনা হয়েছে। এবার পদব্রজে। আট মাইল পথ। আকাশে মেঘ, জনহীন দীর্ঘ আট মাইল পথ। এবার সে চলেছে আত্মরক্ষার প্রেরণায়।

সাপ যেমন দংশন ক'রে গর্তের সন্ধানে ছোটে, বাঘ যেমন শীকার ধরে গভীর অরণ্য-আশ্রয়ে ছোটে, এ হাঁটাও ঠিক তেমনি।

মানব-জীবন-সাধনার সকল পুণ্য সকল দ্যুতি নিঃশেষ হয়েছে। তামসী তার কর্ম করিয়ে নিয়েছে। সে প্রসুপ্ত হয়েছে। এবার জৈব প্রেরণায় জীব ছুটেছে প্রাণপণে। ঐ তামসী এবার মৃত্যুভয়রূপিনী হয়ে তাকে তাডিয়ে নিয়ে চলেছে। চল—চল—চল। পালা—পালা—পালা!

আট মাইল পথ অতিক্রম ক'রে ই-আই আর লাইন।

শেষ রাত্রি তখন। রাত্রির সকল ট্রেণগুলি চলে গেছে। সে না কি ষ্টেশনের ওভারব্রিজের উপর বা তলায় লুকিয়ে বসেছিল। সকালে ট্রেণ। সেই ট্রেণে সে এসে পৌছুল কলকাতায়।

চার

এগারই সেপ্টেম্বর বিকেল বেলা। আমার বাড়ীর দরজার রাস্তা ঘরে আমি দাঁড়িয়ে আছি। দেখলাম নীরবে মাথাটা হেঁট করেই ও এসে বাড়ী ঢুকল। বেশ সন্তর্পণেই পাশ কাটিয়ে গিয়ে চাকরদের থাকবার ঘরে গিয়ে ঢুকল।

আমি কোন প্রশ্ন করলাম না। করবার কোন কারণও ছিল না। বরং প্রশ্ন না করারই হেতু ছিল। ওকে স্নেহ করতাম। কিন্তু তবুও ওর রীতচরিত্রে যে পরিবর্ত্তন ঘটেছে তাতে আর ওকে রাখা চলে না। জবাব দিয়েছি। কথা বলতে গেলে ছেলেটা যদি আবার বলে—আর আমি কিছু করব না, আমাকে তাড়িয়ে দেবেন না—তা হলে হয় তো আমি দুর্বল হয়ে পড়ব। এই কারণেই কথা বলি নি।

এর পর গিয়েছিলাম জাতীয় সংস্কৃতি সংঘের অধিবেশনে। ফিরলাম তখন রাত্রি নটা। খাওয়া দাওয়া সেরে শুতে যাবার সময় শুনলাম মেয়েরা যেন বিরক্ত হয়েছেন কিছু নিয়ে, ওদিকে ঠাকুর ডাকছে, ওঠ্—ওঠ্—! অরে শুনছিস্!

জিজ্ঞাসা করলাম, কি হয়েছে?

শুনলাম যে, ছোঁড়াটা সেই বিকেলে এসে যে ঘরে ঢুকে শুয়েছে, আর ওঠে নি; ডাকলে সাড়া দেয়নি, চা খায় নি এবং এখনও তাই। ডাকলে সাড়াও দিচ্ছে না উঠছেও না; ঠাকুর ওর জন্যেই রান্নাশালের কাজ চুকিয়ে শেষ করতে পারছে না।

আমার মনে হল ছেলেটা ধূর্ত্তামি করেই হোক আর অক্ষম হৃদয়ের ক্ষোভের জন্যই হোক না-খেয়ে পড়ে রয়েছে। আমি বা আমরা গিয়ে ডাকব; স্নেহে বিচলিত হয়ে বলব—আচ্ছা—থাক। আর যেন এমন কাজ করিস নে।

মনটা আমার বিষিয়ে উঠল। এ কি উপদ্রব!

আমি গেলাম চাকরদের ঘরের মধ্যে। একটু যেন অস্বাভাবিক মনে হ'ল। ছেলেটা এ কেমন ভাবে পড়ে রয়েছে? এ যেন জন্তুর আত্মগোপনের প্রয়াসের মত! ঘরের দেওয়াল এবং মেঝের সংযোগ স্থলে যে কোণ সেই কোণে মুখ গুঁজে উপুড় হয়ে পড়ে আছে। পিঠখানা মেঝের সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে নাই, একটা স্থূলকোণের সৃষ্টি করেছে। এবং এই ভঙ্গিতে শুয়ে থাকাটা আমার মনকে আরও তিক্ত ক'রে তুললে।

আমি তাকে ডাকলাম। তিরস্কার করলাম। এই বলেই তিরস্কার করলাম যে, এই ভাবে না-খেয়ে মুখ গুঁজে পড়ে থেকে কোন লাভ হবে না। আমি আর তোকে রাখব না। তোকে কাল আমি জবাব দিয়েছি। কালই তোর এ বাড়ী থেকে চলে যাওয়া উচিত ছিল। আজ বিকেলে তোকে বাড়ী ঢুকতে দেওয়া আমার উচিত হয় নি। শুধু দেশের লোক বলেই কিছু বলিনি। এসেছিস যদি—তবে উপোস ক'রে থেকে গৃহস্থকে বিব্রত করার চেষ্টা কেন তোর? এসেছিস্—খাওয়া দাওয়া কর। কথা কারও সঙ্গে বলতে ইচ্ছা না হয় বলিস নে কিন্তু এমন ক'রে শোকার্তের মত উপুড় হয়ে পড়ে কেন? এ কি! ওঠ্। খাওয়া দাওয়া কর্। আর কাল সকালেই যেন তোর জিনিষপত্র নিয়ে চলে যাবি তুই। কিছুতেই আমার বাড়ীতে আর থাকবি না কাল।

এতক্ষণে ছেলেটা উঠল। চোখ দুটো লাল। মনে হ'ল কেঁদেছে। ঠিক ওই মনে হওয়ার জন্যেই আমি আর তার সামনে থাকলাম না। চলে গেলাম।

১২ই সেপ্টেম্বর। ভোর বেলায় ওঠাই অভ্যাস আমার। রোজই চাকর ঠাকুরদের ডেকে দিয়েছি। তাকেও ডেকেছি।

সেদিন ভোরবেলা উঠে দেখি সে উঠেছে এবং তার জিনিষ-পত্র নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। নীরবেই বেরিয়ে গেল। কথাও বললে না, যাওয়ার সময় চলিত নিয়ম মত প্রণামও করলে না।

১৫ই সেপ্টেম্বর সকালে সিউড়ী জুবিলী লাইব্রেরীর নিমন্ত্রণে আমি সিউড়ী গেলাম। শরৎচন্দ্রের জন্মতিথি। পরদিন জেলা ইস্কুলের রি-ইউনিয়ন উপলক্ষ্যে সভা। তারপর গেলাম মশানজোড়। ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনার রূপায়ণ দেখতে। পরের দিন বিকেল বেলা সিউড়ী থেকে বেরিয়ে এলাম আমদপুর। ট্রেণ ধরে কলকাতা ফিরব। কিন্তু গ্রামে যাবার জন্যে মন উতলা হ'ল। এবং সেখানে-ই শুনলাম—আমার ছোট ভাইয়ের একটি সন্তান জলে ডুবে মারা গেছে।

কলকাতায় না ফিরে গেলাম লাভপুরে।

লাভপুর ষ্টেশনে নামলাম। আমার ছোট ভাই, আর আমার বৈবাহিক ষ্টেশনেই ছিলেন। তাঁদের সঙ্গে বাড়ীর পথে চলবার সময় আমার ছোট ভাই বললেন—দুলাল সবই স্বীকার করেছে।

স্বীকার করেছে? কি স্বীকার করেছে? গাড়ীতে বালি দেওয়া? চুরি?

ছোট ভাই সবিস্ময়ে বললে—কেন? তুমি শোন নি? চিঠি পাও নি?

—কিসের চিঠি? কার চিঠি?

—আমার?

—আমি তো রবিবার রাত্রে বেরিয়েছি কলকাতা থেকে। তার মধ্যে তো কোন চিঠি পাইনি।

—তা হ'লে তুমি কিছু জান না? এখানে দাস খুন হয়েছে। তার ছেলে পুলিশের কাছে স্বীকার করেছে যে সে-ই খুন করেছে।

বাড়ী যেতে যেতে সমস্ত বিবরণ শুনলাম। স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। আমার কল্পনা শক্তি, মস্তিষ্কের ক্রিয়া, সব যেন স্তব্ধ হয়ে গেল। কথা বলতে পারলাম না।

এ কি হ'ল?

সেই কচি সুন্দর মুখ ছেলেটাকে দিয়ে এমন ভয়ঙ্কর ভীষণ অনুষ্ঠান কি ক'রে সম্ভবপর হল? বাড়ী গিয়ে হতবাক হয়েই বসে রইলাম। আমার বাড়ীও শিশুটির অপঘাত মৃত্যুতে শোকার্ত। কিন্তু কাউকে কোন সান্ত্বনাও দিতে পারি নি আমি। ভাবলাম। শুধুই ভাবলাম।

এই সময়েই এলেন থানার দারোগাবাবু।

তাঁর কাছে শুনলাম আর বাকীটা।

১০ই খুন হয়েছে বাপ। বিমাতাটি এখনও বেঁচে আছে। ছোট মেয়েটিও বেঁচে আছে। হাসপাতালে রয়েছে। বিমাতা না কি বলেছে—আমাদের ছেলের মত মনে হল।

মুখে রুমাল বাঁধা ছিল। এবং ভয়ার্ত মেয়েটা বোধ করি সাহস করে তাকাতেও পারেনি। কিংবা সেই তামসীর প্রভাবে ছেলেটার সুন্দর রূপ এমনই ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছিল যে মেলাতেই পারা যায় না দুটো মুখ। ডাঃ জেকিল এবং মিস্টার হাইডের মুখ সত্যই মেলে না।

এর পর ১২ই বেলা দেড়টায় ছোঁড়া এসেছে কলকাতা থেকে।

আমদপুর স্টেশনে তাকে দেখে আমাদের ওখানকার কেউ ভেবেছে, বুঝি সে সংবাদটা পেয়েই কলকাতা থেকে আসছে।

তাকে বলেছে—সংবাদটা পেয়েছে বর্ধমান স্টেশনে।

আর একজনকে বলেছে—আর এক রকম।

লাভপুরে নেমে একজনের প্রশ্নের উত্তরে বলেছে—সংবাদ পেয়েছে আমদপুরে।

স্টেশন থেকে কিছুদূর এসে একজনকে বলেছে—লাভপুর ষ্টেশনে নেমে শুনলাম।

এইভাবে প্রতিটি জনকে বলেছে—ভিন্ন কথা।

পুলিশ তার বিমাতার কথায় প্রথমটা খুব আস্থা স্থাপন করতে পারে নি। কিন্তু এই সঙ্গতিহীন উক্তি-গুলির কথা জানতে পেরেই তাকে এসে প্রশ্ন করে। সে এবার বলে—বাড়ী এসে সংবাদ জেনেছে সে।

দারোগা তাকে জেরা শুরু করেন।

তারপর তাকে এ্যারেষ্ট করে থানায় নিয়ে নির্জন হাজত ঘরে রেখে বলেন—ভেবে দেখ। এত বড় পাপ করে আর মিথ্যে বলে পাপ বাড়িয়ো না। সত্য স্বীকার করলেও ভগবানের দয়া পাবে। ভেবে দেখ।

আধ ঘণ্টা পরেই সে আনুপূর্বিক ঘটনা স্বীকার করে।

হ্যাঁ সে করেছে। এই ভাবে করেছে।

সিউড়ী চালানের সময় না কি দু একজন জিজ্ঞাসা করেছে—তুই? তুই করেছিস?

সে নত মুখেই বলেছে—হুঁ।

এ কথাটা বললে আমাকে আমদপুরের ষ্টলওয়ালা।

আমি সেই রাত্রেই কলকাতা ফিরলাম।

স্তম্ভিত—হতবাক্।

শুধু ভাবছিলাম—কি ক'রে? কি ক'রে হল? কেমন ক'রে হয়? হয় হয়তো! কিন্তু কি ক'রে? সুন্দর এমন ভয়ঙ্কর হয়?

কোমল এমন নিষ্ঠুর হয়?

শান্ত এমন রুদ্র হয়?

ট্রেণে চেপে বসলাম। মনে হতে লাগল—জানালার পাশে পাশে ছুটে চলেছে সেই ছেলেটার মুখ।

সমস্ত রাত্রি ট্রেনে এসে সকাল বেলা হাওড়া পৌঁছুন। কামরায় আমি একা। ছুটন্ত ট্রেনের জানালার ওপাশে সেই ছেলেটার মুখ। সে যেন ট্রেনের ফুটবোর্ডে চড়ে চলেছে অথবা শূন্য লোকে ভেসে চলেছে। আমি নির্বাক স্তম্ভিত হয়ে রয়েছি। মনের চিন্তার গতি, স্মরণ করার শক্তি—সব হারিয়েছি।

এর মধ্যে কোন বিচিত্র রহস্যই নেই। প্রচণ্ড কিছু, সম্পূর্ণ রূপে অবিশ্বাস্য কিছু আকস্মিক ভাবে ঘটলে মানুষ এমনি বিস্ময়-স্তম্ভিতই হয়ে থাকে। ছেলেটার মুখ আমারই মনের প্রতিচ্ছবি তাতে কোন সন্দেহই নেই। বর্ধমান এসে পৌঁছুলাম যখন তখন মধ্যরাত্রি, বোধ হয় একটার কাছাকাছি। বর্ধমানে আমার এই বিস্ময়ের ঘোর স্তম্ভিত ভাবটা যেন কাটল—আলোর ছটায়। এতক্ষণে মনে পড়ল যে—বাড়ী থেকে বের হবার সময় মা খাবার দিয়েছেন, একটা বোতলে জলও দিয়েছেন, খাওয়া হয় নি, খেতে ভুলে গিয়েছি। একবার চেষ্টা করলাম খাবার, কিন্তু ইচ্ছে হল না।

বর্ধমানে ট্রেনখানা ঘণ্টা দুয়েক কি তিন ঘণ্টার কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকে, তারপর নাম বদল করে লোকাল ট্রেন হয়ে আবার রওনা হয় হাওড়া। কামরাটার দরজা জানালাগুলি বন্ধ করে আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়লাম। অন্ধকারে শুয়ে ঘটনাগুলি ভাবলাম।

মনে হল ছেলেটার ক্রোধ তো ছিল আমার এবং ড্রাইভারের উপর! সে যেভাবে কলকাতা থেকে একশো আঠার মাইল পথ অতিক্রম ক'রে এসে এই ভীষণ রক্ত তাণ্ডব খেলে গেছে—তার চেয়ে তো কলকাতার মত বিরাট জনারণ্যে প্রতীক্ষা ক'রে রাত্রে আমার বাড়ীতে এসে আমাদের উপর এই খেলা খেলে যাওয়া সহজ ছিল। তা সে কেন করলে না? সহস্র অপরাধ সত্ত্বেও বাপ যে বাপ। বহু মমতার স্মৃতিও তো তার সঙ্গে জড়ানো আছে!

আশ্চর্য বোধ করি এইটুকু যে, এই মুহূর্তে মনের মধ্যে ওই ছেলেটা এসে দাঁড়িয়ে এর জবাব দিলে না। ছেলেটার বদলে মনের মধ্যে এসে আসন গ্রহণ করলেন আর একজন। তিনি ওই সন্ন্যাসী। সেই অশীতিপর সবল সক্ষম দেহ যোগী—গোপাল দাসীর গুরু। তাঁকেই আমার মনে পড়ে গেল। না। কথাটা ঠিক অভিব্যক্ত হ'ল না। বাস্তববাদী বলুন, মনে পড়ে গেল। আমি বলব তিনি এসে দাঁড়ালেন আমার মনে। তাঁর কথা শুনলাম, তাঁর সম্মুখের হোম কুণ্ডের অগ্নির শিখার দীপ্তি গন্ধ উত্তাপ অনুভব করলাম। ক্ষীণ স্মিতহাসি তাঁর মুখে। তিনি বললেন, ন্যায়; এ বিশ্বে ন্যায় ও অন্যায়ের যে অমোঘ নীতি আছে—সেই নীতির ন্যায় ছিল তোমার দিকে। তাকে সে লঙ্ঘন করতে পারে নি। তোমার পুণ্যবল ক্ষীণ হয় নি অন্যায়ের দ্বারা। তাই মহাতামসী তার মুখ ফিরিয়েছিল তার বাপের দিকে—সেইখানে ছিল তার অন্যায়ের উপর শোধ নেওয়ার অধিকার। সেইখানে ছিল তার জীবনের সকল বন্ধনের গ্রন্থি। সেই গ্রন্থির আকর্ষণ তাকে প্রবল বেগে টেনেছিল।

মনের মধ্যে তাঁর আবির্ভাবে বা সন্ন্যাসীকে মনে পড়ায়, আমি একবিন্দু বিস্ময় অনুভব করি নি; একবারও প্রশ্ন করি নি নিজেকে—বা তাঁকে—এঁকে দেখছি কেন বা আপনি কেন এলেন—কই ডাকি নি তো! তাঁর কথার উত্তরে তাঁকে প্রশ্ন করেছিলাম—মহাতামসীর কথা আপনি বলেছিলেন আমার মনে আছে। তখন বলেছিলেন মহাতামসীর ধর্ম হ'ল—জ্যোতির্ময়তায় তার আত্মপ্রকাশকে গ্রাস করা। সেখানে ন্যায়ের বাধাই বা দাঁড়ায় কোথায়? পুণ্যের প্রশ্নই বা আসে কি ক'রে? এই ভারতবর্ষের মহাপুণ্যের মূর্তমান প্রতীক, অহিংসার সাধনায় সিদ্ধ পুরুষ মহাত্মা গান্ধীকে হত্যা করে কি ক'রে?

তিনি বললেন—ভুল করছ ভাই। তোমাদের গান্ধীজির হত্যায় মহাতামসীর লীলা নাই। যে তাঁকে হত্যা করতে চেষ্টা করেছে—তার সঙ্গে এই বাচ্চার তুলনা কর ভাই। একটার পিছে ক্রোধের সঙ্গে কত বুদ্ধি, কত বিচার, কত খেল দেখ। আর এই লোকটিরও একটা জ্যোতি ছিল; যুদ্ধের মধ্য দিয়ে, হত্যার ভিতর দিয়ে বহুজনের পুণ্য সাধনের একটা পথ ছিল। এখানে শক্তি তো সচেতন ভাই। সচেতন কিন্তু ভ্রান্ত। যা দেবী সর্বভূতেষু ভ্রান্তিরূপেন সংস্থিতা, নমস্তস্যৈ—নমস্তস্যৈ—নমস্তস্যৈ নমো নম। এ কথা ভুলে যেয়ো না ভাই। ভ্রান্তি রূপে তাঁর যে খেলা ভাই সে খেলায় আলো নিভিয়ে দেন না; আলোকে, জ্যোতিকে আরও উজ্জ্বল করে তোলেন; মৃত্যু অমৃত হয়ে যায় তারাশঙ্কর। আর এ হল—কাল-রাত্রির্মহারাত্রির্মোহরাশিশ্চ দারুণা। এর মধ্যে সব ডুবে যায় দাদা। এ রূপ কোথা হয় জান ভাই, যেখানে সাধনার মধ্যে পাপের বীজ থাকে সেইখানে। রক্তবীজ তপস্যা করেছিল—তার যত বিন্দু রক্ত তত সংখ্যক রক্তবীজে বেঁচে উঠার বর সে আদায় করেছিল—পাপ করবে বলে, অন্যায় করবে বলে। চণ্ড মুণ্ড দুই ফৌজদার—তাদেরও তাই। তাই সেখানে মহাতামসী শক্তির দেহ থেকে বেরিয়ে আসেন—চামুণ্ডা রূপে। অট্টহাস, শুষ্কমাংসাতি ভৈরবা, নাদাপূরিত দিংমুখা। এই বাচ্চাটার বংশে পাপের বীজ তিন পুরুষ ধরে খেলা করছে ভাই। লগন্ পেয়ে সে খেলার প্রকাশ হয়ে গেল। খেলার মজাটা দেখ ভাই। মহাতামসী লোভ রূপে রয়েছে, কামরূপে রয়েছে, ক্রোধ রূপে রয়েছে, ক্ষুধা রূপে রয়েছে, তৃষ্ণা রূপে রয়েছে, পুষ্টি রূপে রয়েছে, ত্যাগ রূপে রয়েছে, বুদ্ধি রূপে রয়েছে, ভ্রান্তি রূপে রয়েছে, মেধা রূপে রয়েছে, বোধি রূপে রয়েছে, চৈতন্য রূপে রয়েছে, সবেই আছে সে। নিজের সঙ্গে চলছে তার নিজের লড়াই। এই

লড়াইয়ে যখন কাম ক্রোধ লোভ প্রধান হয়ে ওঠে তারাই তখন চণ্ডমুণ্ড রক্তবীজ আবার তাদেরই তিনি বিনাশ করেন ওই চামুণ্ডা রূপে। ছেলেটা মারলে বাপকে—বাপের ভিতর ভাই সেই তামসীর খেলায় ছিল শুধু লোভ কাম ক্রোধ। সেই পাপের বীজে সে মহাপ্রবল হয়ে দৈত্য হয়ে উঠেছিল। আবার এই বাচ্চাটার দশা ভাব।

—তার ফাঁসী হবে খুব সম্ভব।

—সে তো তার নিজের ভিতরের খেল নয় দাদা! সে খেল আলাদা খেল। সে ভাই মানুষের বুদ্ধির খেল। তাতে তো ওই খেলের গতি পাল্টাচ্ছে না। কেটে দেওয়া হচ্ছে। ভাই বাচ্চাটা যদি পাকড়া না যেত, কি বাচ্চাটা যদি খালাস পায় তবে তো ভাই এই লীলা তুমি ঠিক দেখতে পাবে। ধরতে পারবে। কি হবে ধ্যান করো ভাই। তুমি তো পারবে ধ্যান করতে। তুমি তো ভাই উপাখ্যান বানাও, সে তো সহজ নয়, জীবনের ধ্যান না হলে তো উপাখ্যান হয় না। করো ধ্যান।

এরই মধ্যে খানিকটা ঘুমও এসেছিল। জেগে যখন উঠলাম তখন রাত্রি শেষ হয়েই এসেছে। মাথা ঝিম্‌ঝিম্ করছিল সারারাত্রির শ্রমে। বাথরুমে গেলাম। সামনেই আয়নাটায় নিজের ছবি দেখে শিউরে উঠলাম। চোখ দুটো লাল হয়ে উঠেছে, একে শীর্ণমুখ—সারা রাত্রির এই মানসিক যন্ত্রণায় শীর্ণতর দেখাচ্ছে—মনে হল আমি যেন পাগল হয়ে যাব।

তাড়াতাড়ি কল খুলে মুখ হাত ধুয়ে প্রচুর জল ঢাললাম মাথায়। ফিরে এসে আবার চোখ বুজলাম ক্লান্ত ভাবে। কিন্তু তাতেও নিষ্কৃতি পেলাম না, মনের মধ্যে এবার এসে দাঁড়াল ওই ছেলেটা।

নির্বাক স্তব্ধ—চোখ দুটো রক্তাভ—মুখ বিশীর্ণ, দেহ শীর্ণ, অসীম অসহ্য কোন যন্ত্রণায় তার প্রাণপুরুষ অধীর হয়ে উঠেছে। শীর্ণ শুষ্ক

ঠোঁট দুটো থর থর ক'রে কাঁপছে, চোখের রক্তাভায় মনে হচ্ছে বহু অশ্রু ঝ'রে পড়ছে, কিন্তু সে বাইরে নয় অন্তরে অন্তরে। বাইরে তাতে অঙ্গারের জ্বালা। তাকে ডাকলে সে সাড়া দেয় না—চমকে ওঠে, হাসে না—আরও বিশুষ্ক হয়ে ওঠে। চৈতন্য মুছে গেছে—জৈব চেতনা তাও অতি ক্ষীণ ভাবে প্রবাহিত। যে দুর্দান্ত সাহস শক্তি তার জন্মগত বংশগত সে নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছে, আছে শুধু ভয়—চমক—বিরক্তি।

*　　　　*　　　　*

মনস্তত্ত্ববিদ্‌রাও ঝেড়ে মুছে নিয়ে কথাটা অস্বীকার করবেন না আমি জানি। এর প্রতিক্রিয়ায় আনন্দদুলাল বলে ওই ছেলেটির পাগল হওয়াই স্বাভাবিক। পাগল হয়েই যাচ্ছে সে—বা গিয়েছে।

তাতে আমার ঝগড়া নেই। কেউ বাদপ্রতিবাদ করতে এলেও করব না। আমি যা অনুভূতিতে উপলব্ধি করেছি, প্রত্যক্ষ করেছি, তাই প্রকাশ করেছি।

সকল রিপুকে জয় করতে না পারলে পূর্ণ চৈতন্যে উপনীত হওয়া যায় না। মধ্যে মধ্যে তবুও আকস্মিক ভাবে বিচিত্র ঘটনা সংস্থানে বিপরীতধর্মী ভাবসংঘাতের মধ্যে সৌভাগ্য বশে বা পুণ্যবলে যদি নিজেকে মানুষ জীবনাসনে স্থির রাখতে পারে—তবে মুহূর্তে ধ্যানস্থ হয়ে যায় চিত্ত এবং সেই মুহূর্তটিতে চৈতন্য জ্যোতির ঝলকের মত জীবনকে ধন্য ক'রে মহারহস্যের একটা আভাস দিয়ে যায়। সেই মুহূর্তের দেখা মিথ্যা হয় না। যে দেখে তার জীবনে ওই দেখার স্মৃতি মহাসম্পদ।

ঠিক এই কারণেই আমি যান্ত্রিক নিয়মে কঠোর শাসনে শৃঙ্খলার অভ্যাসে লোভরূপিণী কামরূপিণী মোহরূপিণী হিংসারূপিণী আদিম শক্তিকে—কালরাত্রি মহারাত্রি মোহরাত্রিকে, কৃষ্ণবর্ণাকে, ধূম্রবর্ণা

অতিরৌদ্র মহাভীষণাকে—প্রসন্না লজ্জারূপিণী শান্তিরূপিণী শ্রদ্ধারূপিণী দয়ারূপিণী তুষ্টিরূপিণী মেধারূপিণী বোধিরূপিণী অমৃতময়ী চৈতন্যময়ী জ্যোতির্ময়ী গৌরী দিবারূপিণীতে রূপান্তরিতা করা যায় না বলেই দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। তার জন্য প্রয়োজন তপস্যার, সাধনার। শাসনের ভয়ে অভ্যাসের বশে ওই প্রবৃত্তিরূপিণী আদিম শক্তিকে বিনাশের কল্পনা করে বাতুলে।

আদিম জীব-জীবন থেকে মানুষের জীবন পর্যন্ত রূপান্তরে সাধনার যে ব্যগ্রতা যে আকুলতা যে তপস্যা—তেমনি তপস্যা। সেই তপস্যায় সে মন পেয়েছে, মনন পেয়ে চিন্তা শক্তিকে পেয়েছে—চিত্তকে আবিষ্কার করেছে; সেই চিন্তার সেই চিত্তের পরিবর্তন সম্ভব তপস্যার শুদ্ধির মধ্যে।

ত্বং বৈষ্ণবীশক্তিরনন্তবীর্যা
বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া

একথা এই বিজ্ঞানের যুগে বলা লজ্জা এবং উপহাসের কথা হয়ে উঠেছে। কিন্তু সংস্কৃত ভাষা এবং এই শক্তির কাছে নতি স্বীকার করে আপন চিত্ত শুদ্ধির জন্য আপন অন্তরের শক্তির কাছে প্রার্থনা জানানো আমি লজ্জার কথা মনে করিনে। বলি—তুমি প্রসন্ন হও। অতিরৌদ্রা তুমি অতি সৌম্যা রূপে আবির্ভূত হও।

মহারাত্রি মহাবিদ্যে নারায়ণি! নমোস্তুতে !!

আদি অন্তহীন বিশ্বশক্তি যা না কি জলে স্থলে অন্তরীক্ষে মহাশূন্যে অপার রহস্যরূপিণী অনন্ত বৈচিত্র্যে অণু-পরমাণু থেকে গ্রহমণ্ডলে ব্যপ্ত প্রসারিত—তারই মধ্যে মানুষ অন্তরলোকে বুদ্ধি ও অনুভূতির সাহায্যে তাকে আবিষ্কারে ব্যাপৃত। জড়শক্তির মধ্যস্থায়িনী শক্তি জড় কাঠিন্যের নিয়মে আবদ্ধ; তাকে আঘাত করলেই যোজনায় বিচ্ছিন্ন করণে সে প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে, সমান বেগে কল্যাণ অকল্যাণ বহন

করে আনে। তার চেয়েও বিচিত্র সজীব জীবনের মানুষের চিত্তলোক। সে এই বিচিত্রকে আবিষ্কার করে, অনুভব করে। সেই অনুভবের মধ্যেই আবার তার প্রকাশ হয় নবরূপে।

"মহামায়া মহাকালী মহামারী ক্ষুধাতৃষা। নিদ্রাতৃষ্ণা চৈকবীরা কালরাত্রির্দুরাত্যয়া।"

তিনিই মানুষের সাধনায় হন—

"মহাবিদ্যা মহাবাণী ভারতী বাক্‌সরস্বতী। আর্যাব্রাহ্মী কামধেনুর্বেদগর্ভা চ ধীশ্বরী।"

সেই তাঁকে প্রণাম করি। আর কামনা করি—মহাপঙ্কে মহান্ধকারে মহাগর্তে যে পড়ে—বিশেষ করে ওই ছেলেটা, সে যেন খুঁজে পায় পরিত্রাতাকে, যিনি এর মধ্যেও দিতে পারবেন মুক্তির মন্ত্র।